আষাঢ়ে দেশে

শ্রীপরিমল গোস্বামী

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষে
প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
মার্চ, ১৯৪৪

এক টাকা চারি আনা।

জেনারেল প্রিণ্টার্স র‍্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীমান্ হিমানীশ গোস্বামী
কল্যাণীয়েষু

১৩৪৯ সালের আষাঢ় মাস থেকে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত রঙমশাল নামক ছোটদের মাসিক পত্রে আষাঢ়ে দেশে মাসিক কিস্তিতে ছাপা হ'তে থাকে। আষাঢ়ে দেশে কোন্ জাতীয় কাহিনী তা আমি তখন ঠিক করতে পারিনি।

রঙমশালের পরিচালক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ, আষাঢ়ে দেশে প্রকাশের আগে রঙমশালে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—আষাঢ়ে দেশে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের উপন্যাস। কাহিনীটি কয়েক মাস ছাপা হওয়ার পর আনন্দবাজার পত্রিকায়, ১৩৫০ সালের বৈশাখ-সংখ্যা রঙমশালের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। তখন সমালোচক বলেন—"উপন্যাসটি শিশুসাহিত্যে একটি অভিনব ধারার সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া মনে করি।"

সুতরাং 'উপন্যাস' নামটি মেনে নিতে হ'ল, যদিও এটাকে 'শিশু'-সাহিত্য নাম দেওয়ায় আমার এখনও আপত্তি আছে।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেন এই বইতে রঙমশাল থেকে চারখানা ব্লক আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। তাঁকে সেজন্য ধন্যবাদ জানাই।

৩৫-ডি কৈলাস বসু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। ২৪-৩-৪৪

শ্রীপরিমল গোস্বামী

প্রথম অধ্যায়

কাঞ্চন বুড়ো

পূজোর ছুটিতে কোথায়ও যেতেই হবে—মন্টু আর নিতাইয়ের সঙ্গে ক'দিন ধ'রে পরামর্শ করছিলাম—কলকাতার বাইরে আশেপাশে কোথায়ও।

মন্টুর অভিমত হচ্ছে এই যে কলকাতার খুব কাছে যাওয়া আর একেবারে কোথাও না যাওয়া একই কথা। কিন্তু আমি বেশি দূরে যেতে চাইনি তার কারণ নিতাই নিতান্ত ছেলেমানুষ, ওকে নিয়ে দূরে গেলে শেষটায় আমাদেরই মুস্কিল হবে।

এই নিয়ে ক'দিন ধরেই আমাদের মধ্যে তর্ক চলছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখি আমরা তিনজনেই শিয়ালদ স্টেশনে গিয়ে টিকিট কিনে দার্জিলিং মেলে চেপে বসেছি!

তারপর ভাল মনে নেই, হঠাৎ দেখি হিমালয়ে উঠছি। ছোট্ট রেলগাড়ি, ছোট্ট একটা এঞ্জিনে টেনে নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছে। আমরা যত উপরে উঠছি ততই অপরূপ সব দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ছে। শালবনের ভিতর দিয়ে, পাহাড়ের উপর দিয়ে, ভিতর দিয়ে, এঁকে বেঁকে সোঁ সোঁ শব্দ করতে করতে গাড়িখানা চলছে ঠিক সাপের

মতো। রেলের আশেপাশে কত চেনা-অচেনা ফুল। ফার্নের ঝোপ, কলাবন, গাঁদাফুল, বড় বড় ধুতুরাফুল, আমাদের দু'পাশে। পাহাড়ের মানুষগুলো সব নতুন, তাদের গায়ের রং কত সুন্দর, তাদের পোষাক অদ্ভুত ধরনের—তাদের গায়ে কত শক্তি! পিঠে এক একটা প্রকাণ্ড বোঝা নিয়ে তারা চলেছে।

নীচে উপরে যে-দিকে তাকাই, কেবলই চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। শালবন ভেদ ক'রে আমাদের গাড়ি পাহাড়ের ধার দিয়ে চলেছে, নীচে তাকিয়ে দেখি অনেক উপরে উঠে এসেছি। বাংলাদেশের সমতল ভূমি ছবির মতো দেখাচ্ছে, কত দূরে, কত নীচে, অথচ কত স্পষ্ট! শত শত ঝরনা পাহাড় থেকে সমতল ভূমির উপর ব'য়ে চলেছে। সেই উঁচু জায়গা থেকে মনে হচ্ছিল যেন মানচিত্রের উপর নদীর নীল রেখাগুলো দেখছি।

মুহূর্তে সে ছবি অদৃশ্য হয়ে গেল, তারপর ধীরে ধীরে আমরা মেঘের রাজ্যে এসে পৌঁছলাম। ক্রমে শীত করতে লাগল। হাত পা ভীষণ কাঁপতে লাগল। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, মাঝে মাঝে মেঘ এসে আমাদের একেবারে ঢেকে ফেলছে। গায়ে ছিল পাতলা জামা, কিন্তু কি আশ্চর্য, একটু শীত করতেই সেই জামা গরম মোটা জামায় পরিণত হ'ল, পায়ে আপনা থেকেই মোজা গজিয়ে গেল, গলার চাদরখানা উলের গলাবন্ধে পরিণত হ'ল! সামনে চেয়ে দেখি

তুষার ঢাকা হিমালয়ের চূড়া, দেখতে দেখতে কখন সেইখানে এসে পড়েছি!

তখন চারদিকে চেয়ে দেখলাম, আমরা যে ট্রেনখানায় আসছিলাম, কোথায়ও তার চিহ্ন নেই—আমরা বরফের উপর দিয়ে হিমালয় পার হয়ে চলেছি। ভয়ানক শীত। মোটা জামা, মোটা মোজা, হাতে মোটা দস্তানা, গলায় মোটা গলাবন্ধ, কিন্তু শীত এত বেশি যে কাঁপুনি কিছুতেই থামে না।

আমাদের চারদিকে কেবল তুষার আর তুষার। মাঝে মাঝে পাইন গাছের দু'একটা মাথা দেখা যায় আমাদের পায়ের নীচে, কিন্তু সেও তুষারে ঢাকা। আমরা পা টিপে টিপে ক্রমেই উপরে উঠে যাচ্ছি আর ক্রমে শীত বাড়ছে। হাওয়া নয় তো যেন তুষারের ঝড়। ঝড়ে তুষারকণা উড়ে এসে আমাদের চোখেমুখে স্ূঁচের মতো বিঁধছে, কিন্তু উপায় নেই, চলতেই হবে।

এইভাবে চলতে চলতে হঠাৎ আমাদের পায়ের কাছ থেকে একটা বরফের পাহাড় ভীষণ শব্দে ফেটে ধ্বসে গেল। যেখানটায় ভেঙে পড়ল সেখানটা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম! বরফের পাহাড় সেখানটায় প'ড়ে চারদিকে খণ্ড খণ্ড হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ল, তারপর সব ধোঁয়ার মতো দেখাতে লাগল।

আমাদের সামনের পথ এইভাবে বন্ধ হ'য়ে গেল, কেননা বরফের পাহাড় সামনের পথটাকে-সুদ্ধ সঙ্গে নামিয়ে নিয়ে গেছে। তখন কি করি! সেই ভয়ানক শীতে আর তো দাঁড়িয়ে

থাকা যায় না। আমাদের মধ্যে যার নাম মণ্টু সে বলল, "এক কাপ্ ক'রে চা খেলে হয় না?"

কিন্তু তার বলার সঙ্গে সঙ্গে তার কথাগুলোকে সেই তুষারের ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল। কথাগুলো ক্রমেই চীৎকারের মতো শোনাতে লাগল, তারপর মেঘের ডাকের মতো, পর্বতের সবগুলো চূড়ায় সে শব্দ গিয়ে আছাড় খেতে লাগল। চূড়াগুলো কেঁপে উঠল। কাঞ্চনজঙ্ঘা চূড়া আমাদের সামনেই ছিল, সূর্যের আলোয় সে যে কি চমৎকার দেখাচ্ছিল! কিন্তু শব্দ তার কাছে যেতেই সে ভীষণ চমকে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা থেকে অনেকখানি জমানো বরফ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে নীচে পড়ে গেল। সেই বরফের নীচে ছিল তার চোখ নাক মুখ। বরফ ভেঙে যাওয়াতে সব দেখা যেতে লাগল। তার প্রকাণ্ড দুটো চোখ আমাদের দিকে চেয়ে হাসছে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা আমাদের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করল। সে বলল, "তোমাদের ভয় নেই, আমি কাঞ্চনবুড়ো, তোমরা কে?"

আমি বললাম, "আমরা কলকাতা থেকে আসছি।"

"কোথায় যাবে?"

"কোথায় যাব ঠিক নেই, তবে এই দিকে চলেছি।"— দিকটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম।

কাঞ্চনবুড়ো বলল, "ও হচ্ছে আমার মেজদা গৌরীশঙ্কর,

ওর কাছে যাবে? ওর পাশে আরও উঁচু একটা চূড়া আছে—সে হচ্ছে এভারেস্ট, আমার বড়দা। পারবে ওর কাঁধে উঠতে?”

বললাম, “পারব কি না কিছুই জানি না, এখানে আসতে পারব তাই কি জানতাম? কিন্তু এসে তো পড়েছি। মনে

হচ্ছে এক পেয়ালা ক'রে চা খেলেই আবার আমরা চলতে পারব। খাওয়াবে চা?”

“নিশ্চয় খাওয়াব।”—ব'লে কাঞ্চনবুড়ো খুব নীচের দিকে তাকিয়ে বলল, “ঐ দেখ সমস্ত পাহাড় জুড়েই আমার চা বাগান। আদেশ করলেই চা তৈরি হ'য়ে আসে। তোমরা ব'স, এখুনি চা আসছে।”

বুড়োর কথায় সেখানে একটুখানি বসতেই গরম চা এসে হাজির হ'ল। নীচে যে-সব কুলি মেয়েদের দেখেছি, তারাই আমাদের চা এনে দিল। চা খেয়ে বড় আরাম হ'ল, বুড়োকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, "তা হ'লে আমরা এখন আসি ?"

বুড়ো বলল, "আচ্ছা, এসো। তবে ফেরবার পথে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যেয়ো। আমি এখানে একা থাকি। আমার কাছে কেউ আসতেই চায় না। হাজার হাজার বছর ধ'রে আমি একা রয়েছি এইখানে। আমার মাথার উপর বরফ জমে থাকে বারো মাস, মাথার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে যায় বারো মাস, কিন্তু তবু আমার নড়বার উপায় নেই।"

"উপায় নেই কেন ?"

"সর্বনাশ। তা হ'লে কি রক্ষা আছে ? আমি এখানে ব'সে তোমাদের দেশের জলের ব্যবস্থা করি। আমার মতো অনেকে আছে এই পর্বতে। আমরা সবাই এখান থেকে মেঘ তৈরি ক'রে সময়-মতো তোমাদের দেশে পাঠাই, ঝরনা তৈরি ক'রে জল পাঠাই। এমনি কতকাল ধ'রে করছি। কাজেই আমরা কোথায়ও যেতে পারি না।"

নিতাই ছেলেমানুষের মতোই জিজ্ঞাসা ক'রে বসল, "তুমি বুঝি এখানকার কর্পোরেশনে কাজ কর ?"

বুড়ো এ কথায় খুব হাসতে লাগল। আমরাও খুব হাসলাম। বুড়ো বলল, "ঠিকই বলেছ তুমি। আমি এই হিমালয়ের কর্পোরেশনেই চাকরি করছি, কিন্তু বড় শক্ত

চাকরি—তোমরা যেন এ চাকরির লোভ ক'রো না কখনো।"

বুড়োর কথা-বার্তায় আমাদের খুবই আনন্দ হ'ল। বললাম, "ফেরবার সময় তোমার সঙ্গে আমরা নিশ্চয়ই দেখা ক'রে যাব। এখন তো আর সময় নেই, নইলে তোমার কাছে ব'সে অনেকক্ষণ আলাপ করা যেত।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

অধঃপতন

বুড়োর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা আবার চলতে লাগলাম। চলতে চলতে হঠাৎ মনে হ'ল আমাদের পায়ের নীচের বরফ আমাদের নিয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ছে। মনে হ'তেই ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠলাম। সঙ্গীরাও চেঁচাতে লাগল। কিন্তু চেঁচিয়ে কি হবে—ছুটে পালাবার কোনো উপায় নেই, ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে বরফ আমাদের নীচে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নীচে তাকিয়ে দেখি সে এক ভয়ানক গহ্বর, বাইরে থেকে তার ভিতরের কিছুই দেখা যায় না। যদি ওখানে গিয়ে পড়ি তা হ'লে আর বেঁচে থাকতে হবে না। কাঞ্চনবুড়োর উপর ভয়ানক রাগ হ'ল। সে নাকি আমাদের জন্য জলের ব্যবস্থা করে, অথচ চলন্ত বরফকে একটু থামাতে পারে না!

"বুড়ো, ওগো কাঞ্চন বুড়ো, আমাদের বাঁচাও, আমরা মারা যাচ্ছি! শীগগির আমাদের রক্ষা কর!"—ব'লে সবাই মিলে চেঁচাতে লাগলাম, কিন্তু কোথায় বুড়ো! সে কি আমাদের কথা শুনছে, না তার শোনার কোনো গরজ আছে! এতক্ষণে হয় তো তার মুখ চোখ আবার বরফে ঢেকে গেছে।

কিন্তু এ সব ভাববার আর বেশি সময় ছিল না। বরফ

আমাদের নিয়ে ক্রমেই জোরে ছুটতে লাগল। কে কোথায় ছিটকে পড়ি সেই ভয়ে কারো মুখ দিয়ে আর কথা বেরুচ্ছে না! ভয়ে আমরা হাত ধরাধরি ক'রে চলন্ত বরফের উপর ব'সে পড়লাম। মণ্টু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতেই পকেট থেকে একখানা ছোট্ট খাতা বা'র ক'রে তাতে কি লিখতে লাগল।

আমি কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হি হি···লিহিহি-খ্...ছহহ ?"

মণ্টুর মুখ থেকে যে কথা বেরুলো তার একটি অক্ষরও বোঝা গেল না। সে বলল, "ভা-হা হা হা হা—।" আবার প্রশ্ন করলাম, "কি হি হি ছুহুহুই বুহুহুঝ্তে পা হাহার ছিহি না হা।" নিজের কথাটিও প্রায় ওর মতোই হ'য়ে গেল, তখন বুঝতে পারলাম এখন কিছু বোঝার চেষ্টা না করাই ভাল।

তখন সে খাতাখানা আমার হাতে দিল প'ড়ে দেখবার জন্য। দেখলাম, তাতে এই কথা গুলো লেখা আছে—

বাংলা আর অল্প ইংরেজি ছাড়া আর কোন ভাষা জানি না, এবং মণ্টুও যে বাংলা আর অল্প ইংরেজি ছাড়া

আর কিছু জানে এমন কথা শুনিনি। কাজেই তার এই লেখা দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম।

পরে অবশ্য সব জানতে পেরেছি। মণ্টু বলতে চেয়েছিল সে ডায়েরি লিখছে, কিন্তু কাঁপতে কাঁপতে ডাহাহাহা ছাড়া আর কিছু উচ্চারণ করতে পারেনি। আরও জানতে পেরেছি যে সে বাংলা ভাষাতেই ডায়েরি লিখতে গিয়েছিল, কিন্তু হাত কেঁপে যাওয়াতে তার হাতের লেখার ঐ চেহারা হয়েছে। ওর লেখার ইচ্ছে ছিল, "আমরা এখন বরফের পিঠে চ'ড়ে পাহাড় থেকে ভয়ানক্ জোরে নীচে পড়ছি।"

মণ্টু লুকিয়ে লুকিয়ে তার ভ্রমণ কথা প্রথম থেকেই লিখতে আরম্ভ করেছিল, সেইটে জানতাম না। যাই হোক আমাদের আর সন্দেহ রইল না যে এবারে আর আমাদের রক্ষা নেই। সেই বিরাট গহ্বরটা ক্রমেই যেন হাঁ ক'রে আমাদের গিলতে আসছে, আমরা এইবার তার মুখের মধ্যে গিয়ে পড়ব, আর জীবনে কখনো আলো দেখব না, জীবনে কখনো বাড়ি ফিরতে পারব না, তার মানে জীবনটা ঐখানেই শেষ হবে।

মরতে হবেই। তাই তাড়াতাড়ি চারিদিকে চেয়ে নিলাম। এই সুন্দর আলো, এই সুন্দর পৃথিবী, এখনি চোখে মিলিয়ে যাবে। বড় দুঃখ হ'ল, এতদিন কেন এই আকাশ, এই আলো আর এই পৃথিবীর সব কিছু ভাল ক'রে দেখিনি! কিন্তু আর দুঃখ ক'রে লাভ নেই। আমাদের চলার বেগ

আরও বেড়ে গেছে। আমাদের চারদিকের পাহাড়গুলো যেন তীর বেগে আকাশে উঠে যাচ্ছে—আর আমরা নীচে পড়ছি। চলন্ত বরফের চাপে গাছপালা সব মড়মড় ক'রে ভেঙে যাচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে যত খণ্ড-পাথর ছিল সব ভীষণ শব্দে ছুটছে আমাদের সঙ্গে।

এবারে আরো জোরে চলছি, মাথা ঘুরছে, কিছুই ভাবতে পারছি না। মন, ভাববার শক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। তারপর কি হ'ল? একটা প্রচণ্ড শব্দ। কড়্ কড়্ ক'রে মেঘ ডাকতে ডাকতে মাঝে মাঝে হঠাৎ যেমন এক একটা আকাশ-ফাটা আওয়াজ হয় তেমনি এক অতি ভীষণ শব্দ আমাদের কানে এসে আঘাত করল। মনে হ'ল যেন আমরা হুড়-মুড় ক'রে ভাঙা গাছপালা আর পাথরের বড় বড় টুকরোর সঙ্গে সেই গহ্বরে এসে পড়লাম। তারপরে আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখি আমরা একটা অন্ধকার জায়গায় প'ড়ে আছি। সেটা কি রকম জায়গা কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কেবল বোধ হচ্ছে হাত পা সব ঠাণ্ডায় জমে গেছে। যেখানে হাত বাড়াই সেখানেই মনে হয় যেন জল আর পাথর। জল কল্ কল্ শব্দ করছে। এমন তার স্রোত যে তার মধ্যে পড়লে আমাদের টেনে নিয়ে যাবে। ভাগ্যিস আমরা একটা বড় পাথরের গায়ে সবাই আটকে আছি, নইলে আবার এই জলের স্রোতের সঙ্গে কোথায় ছুটতে হ'ত কে জানে!

মণ্টুকে ডেকে বললাম, "আমরা এখন কোথায়?"

মণ্টু ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "পর্বতের গহ্বরে।"

নিতাই আমাদের সঙ্গে বরাবরই আছে কিন্তু এ পর্যন্ত সে কথা বলেনি, এইবার সে কথা বলল। কিন্তু সে-কথা সাধারণ কথা নয়। ডায়েরি লেখার সময় মণ্টুর হাত দিয়ে যে রকম অক্ষর বেরিয়েছিল, নিতাইএর গলা দিয়ে তেমনি কথা বেরুলো। সে কথা শুরু করল কান্না দিয়ে—

'আঁ ইঁ বাঁ ইঁ যাঁ অঁ!'

এই কথাটা সে বার বার বলতে লাগল। সহজভাবে বললে ওর মানে হয়, "আমি বাড়ি যাব।"

তার যে বাড়ি যাওয়া খুবই দরকার সে কথা আমরা সবাই জানি। আমাদেরও বাড়ি যাওয়া দরকার। কিন্তু মনে করলেই তো আর যাওয়া যাবে না! তাকে বুঝিয়ে বললাম এখন কাঁদবার সময় নেই, এখন কেবল দেখতে হবে কি ক'রে আমরা বেঁচে থাকব। সেই সকালে এক কাপ্ চা খেয়েছি, তারপর আর কিছুই আমাদের ভাগ্যে জোটেনি। এখন বেলা কত জানি না, এটা দিন কি রাত তাও জানি না, সঙ্গে যে ঘড়িটি ছিল সেটা বহুক্ষণ আগে বন্ধ হ'য়ে গেছে। আর চললেও এই অন্ধকারে তা দেখা যেত না। এখন আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে, কি ক'রে আমরা এই চিররাত্রির দেশ থেকে আলোর দেশে ফিরে যাব, তারই পথ খুঁজে বা'র করা।

এই ধরনের অনেক কথা ব'লে নিতাইকে শান্ত করা গেল। তারপর আমরা সবাই মিলে বাইরে যাবার পথ খুঁজতে লাগলাম। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ আমার হাত যেন কার গায়ে লাগল। মনে হ'ল যেন কোনো জন্তু। বিশ্রী একটা গন্ধ নাকে এসে লাগল, ভয়ে সমস্ত গা যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। এই অন্ধকার গহ্বরে এ কোন্ জন্তু?

তৃতীয় অধ্যায়

রয়্যাল বেঙ্গল

সেই জন্তুটি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন ব'লে উঠল, "ভয় পেয়ো না আমি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।"

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার! টাইগার অর্থাৎ বাঘ! অথচ মানুষের মতো কথা বলে! যাই হোক বাঘের মুখে বাংলা কথা শুনে ভয় অনেকটা কেটে গেল। বাঘের উপর কৃতজ্ঞও হ'লাম কম নয়, কেননা যার গায়ে এত শক্তি সে বাংলায় কথা বলে, আর এমন শক্তিমান প্রাণী হ'য়েও বাঙালী ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা পায় না!

জিজ্ঞাসা করলাম, "এখানে কি ক'রে এলে, আর, দেশ ছেড়ে এমন অদ্ভুত জায়গাতেই বা কেন এলে?"

বাঘ বলল, "তোমাদেরই মতো ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম, এবং তোমাদেরই মতো এইখানে এসে পড়েছি।"

বাঘ খুব সহজেই কথাগুলো বলল, কিন্তু বুঝতে পারলাম আসল ব্যাপারটা অত সহজ নয়। কিন্তু তখন আর বাঘের খবর শোনার খুব প্রবৃত্তি ছিল না। তখন যে কথাটা সব চেয়ে জরুরি সেইটেই জিজ্ঞাসা করলাম। ভয়ে ভয়ে বাঘকে বললাম, "বেরিয়ে যাবার কি কোনো পথ নেই এখান থেকে?"

"তোমাদের নেই, কিন্তু আমার আছে। আমি ইচ্ছে

করলেই পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে পারি, কিন্তু তোমরা তা পার না। বিশেষ ক'রে এই গহ্বরটা এমন যে এর গায়ে নখ বেঁধানোও শক্ত। গাছ নেই, এক-আধটা শিকড়ও নেই

যা ধ'রে উপরে উঠতে পার।"—বাঘ দুঃখের সঙ্গে এই কথাগুলো বলল।

আমি বললাম, "তোমার বেরিয়ে যাবার পথ আছে তবে তুমি পড়ে আছ কেন?"

"আর বল কেন দাদা, দেশে ফিরব না ব'লেই দেশ ছেড়ে

বেরিয়েছিলাম। তারপর নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ে এসে পড়লাম। এইখানে এসে মনটা একেবারে বদলে গেল। কেমন যেন একটা ধর্মের ভাব মনে জেগে উঠল। বরফের উপর ব'সে ব'সে একদিন নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলাম। চিন্তা করতে গিয়ে দেখি ছেলেবেলা থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত একটা ভালো কাজ কিছু করিনি।"

বাঘ একটুখানি থেমে আবার বলতে লাগল, "সমস্ত জীবন কেবল হিংসা ক'রে এসেছি। ছাগল, ভেড়া, হরিন, এই সব ধ'রে খেয়েছি, মানুষও কিছু কিছু খেয়েছি, আর দেশময় অত্যাচার ক'রে ফিরেছি। এই সব ভাবতে গিয়ে মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গেল, মনে বড় দুঃখ হ'ল। ভাবলাম আর এ সব করব না; হিমালয়ে যখন এসেই পড়েছি তখন এইখানে ব'সেই একটু সাধনা করব। জায়গাটা সাধনার পক্ষে বড় ভালো।" এই ব'লে সে আবার থামল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "তারপর কি হ'ল?"

রয়্যাল বেঙ্গল বলতে লাগল, "কিছুদিন এই বরফের মরুভূমির উপর সাধনা ক'রে বুঝতে পারলাম—নাঃ, এ তো কাজের কথা নয়! এখানে আমি না খেয়ে আছি বটে কিন্তু তাতে আমার বাহাদুরিটা কোথায়? এখানে খাবার কিছু মেলে না বলেই তো না খেয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছি! যদি আশেপাশে অনেক খাবার থাকত এবং তার মধ্যে

না খেয়ে ব'সে থাকতে পারতাম, তবেই না বোঝা যেত আমার ক্ষমতা! এই সব ব'সে ব'সে ভাবছি, এমন সময় বরফ ভেঙে গড়াতে গড়াতে এখানে এসে পড়লাম।"

বললাম, "এখানটায় তোমার ধর্মসাধনা ঠিক মতো চলছে তো?"

"অদ্ভুত ভালো চলছে!" রয়্যাল বেঙ্গল বলল। "আজ প্রায় সাত দিন হ'ল এখানে এসেছি—সাত দিন কিছুই খাইনি। আমার যে খুব মনের জোর আছে এ থেকে তা বুঝতে পেরেছি। আর তাতে ফল হয়েছে কি জান? আমি ধর্মসাধনার পথে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পেরেছি। তোমরা যে এখানে এসে পড়েছ, এটাও আমার একটা পরীক্ষা। বোধ হয় ভগবানই তোমাদের পাঠিয়েছেন আমাকে পরীক্ষা করার জন্য। ইচ্ছে করলেই—"

"না না বাঘ তুমি কি বলছ?"

"শোন, গোলমাল ক'রো না। ইচ্ছে করলেই তোমাদের সবাইকে আমি খেতে পারি। তোমরা তিনজন আছ, তিন তিরিক্কে ন'টা দিন তো আমার বেশ ভালো ভাবেই চ'লে যেত। বুঝতে পারছ?"

মন্টু আর নিতাই আমার দুই হাত দু'দিক থেকে চেপে ধ'রে ছিল। এই কথার পর আমার হাত দু'খানা তাদের মুঠোর মধ্যে পিষে যেতে লাগল। ভয়ে তাদের মুঠো ক্রমেই লোহার মতো শক্ত হয়ে গেল। ভয়টা আমারও কম

হয়নি। কি জানি যদি বাঘ ধর্ম সম্বন্ধে মত বদলায়! তা হ'লে আমাদের আর রক্ষা নেই। সে এক্ষুনি বলেছে আমাদের তিনজনকে ন'দিন ধ'রে খাবে! তাই ভয়ে ভয়ে তাকে বললাম, "ভাই বাঘ, ধর্মই পৃথিবীতে সব চেয়ে ভালো জিনিস। তোমার মতো হিংস্র একটি জন্তু যদি ধার্মিক হয়, তা হ'লে কেমন চমৎকার হয় বল দেখি!"

কিন্তু বাঘকে ধর্ম সম্বন্ধে বেশি কিছু বলতে পারলাম না। তার কারণ, আমি নিজেই ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানি না। ইস্কুলে যে রচনার বই পড়েছি তাতে "সাধুতা" সম্বন্ধে একটি রচনা ছিল। মাত্র সেইটেই আমি জানতাম। কিন্তু বাঘ যে-ধর্ম পালন করতে চায়, যে-ভাবে সে না খেয়ে সাধনা করতে চায়, সে বিষয়ে সেই রচনা বইতে একটি কথাও নেই। কাজেই নিরুপায় হ'য়ে "সাধুতা" সম্বন্ধে যেটুকু জানি তাই বাঘকে বোঝাতে লাগলাম।

তাকে বললাম, "ভাই বাঘ, সাধু লোককেই সকলে ভালবাসে। পরের জিনিসে লোভ করা, পরের জিনিস চুরি করা, এসব ভয়ানক অন্যায়। ধর তুমি যদি তোমার গুরুর কথার অবাধ্য হও এবং ক্লাসের পড়া ঠিক মতো মুখস্থ না কর—"

কিন্তু এই কথাগুলোও ভালো ক'রে বলতে পারলাম না। আমি বুঝতে পারলাম, "সাধুতা" সম্বন্ধে যে রচনাটি আমার পড়া ছিল সেটাও ভালো মনে নেই। "ছাত্রের কর্তব্য"

সম্বন্ধে আর একটি রচনা পড়েছিলাম, তারই সঙ্গে গোলমাল ক'রে বাঘকে "ছাত্রের কর্তব্য" সম্বন্ধে বোঝাতে আরম্ভ করেছি!

অন্য সময় হ'লে নিজের ভুলে নিজেই হেসে অস্থির হতাম, কিন্তু বাঘের সামনে হাসার সাহস হ'ল না। আমি হাসতে পারলাম না; কিন্তু আমার কথায় বাঘ হাসতে লাগল।

মনে পড়ল একবার আমাদের ইস্কুলে ইন্‌স্‌পেক্‌টর এসে আমাদের ক্লাসে পৃথিবী সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। নিতাই ভড়কে গিয়ে সূর্য সম্বন্ধে মুখস্থ করা রচনাটি আবৃত্তি করেছিল। আমারও আজ সেই দশা। স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌টর আর রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারে যে কোনো তফাৎ আছে তা মনেই হ'ল না।

বাঘ হাসি থামিয়ে বলল, "আমি সব বুঝতে পেরেছি, তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না! ছাত্রের কর্তব্য সম্বন্ধে তুমি যা বলতে চাইছ সেটুকু আমার জানা আছে।"

আমি ভরসা পেয়ে বললাম, "আচ্ছা, আর কিছু বলব না, তোমার তো অজানা কিছুই নেই। তা ছাড়া তুমি এই সাত দিন যে তপস্যা করেছ তাতে তোমার দিব্য দৃষ্টি লাভ হয়েছে। কিন্তু ভাই বাঘ, তুমি যে আগে বলেছ এখানে এসে খাবার জিনিষ পেয়েও তুমি তা খাওনি, সেই খাবার জিনিসটি কি? আমরা তো এখানে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না! একটা ইঁদুরও এখানে নেই! তবে তুমি কিসের কথা বলেছ?

বাঘ গম্ভীর ভাবে বলল, "এখানে মানুষের গন্ধ পেয়েছি। আমার পাশে একটা বড় পাথর আছে, সেইটের ফাঁক দিয়ে শুধু মানুষের গন্ধ নয়, মানুষের শব্দও আমি শুনতে পেয়েছি! এই পাথরটা সরালে সেই মানুষের দেশে যাবার একটা পথ পাওয়া যাবে ব'লে আমার মনে হচ্ছে।"

অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না, তবু বাঘের প্রত্যেকটি কথা সত্য ব'লে বিশ্বাস করছিলাম। বাঘ বলতে লাগল, "ইচ্ছে করলে তোমরা এই পথে যেতে পার। আর আমার মতে তোমাদের যাওয়াই ভালো, গেলে হয়তো সেখানে খেয়েদেয়ে বাঁচতে পারবে। কিন্তু এখানে থাকলে তোমাদের বাঁচার আর কোনো আশাই নেই। যাবে? যদি যাও তো বল, পাথরটা একটু সরিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু ওখানে গিয়ে যদি মনে হয় কোনো বিপদে পড়েছ তা হ'লে আমাকে খবর দিও, সাহায্য করব।"

বাঘের কথা শুনে আমাদের মনে যে কি আনন্দ হ'ল তা আর কি বলব! আমরা সবাই মিলে বাঘের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। পরে শুনেছি, মণ্টু আর নিতাই অন্ধকারে বাঘের পা টিপে দিয়েছে, এমন কি, তার পিঠও চুলকিয়ে দিয়েছে। বাঘের প্রতি তাদের এমনি কৃতজ্ঞতা হয়েছিল!

চতুর্থ অধ্যায়

নতুন দেশে যাত্রা

আমরা গহ্বরের মধ্যেকার সেই পথ দিয়ে নতুন দেশে রওনা হ'লাম। বেরিয়ে কিছু দূর গিয়েই তাদের দেশে এসে পড়লাম। সেটা একটা শহর ব'লে মনে হ'ল। অদ্ভুত তার সব পথ। তা ছাড়া ভারি নোংরা। পথে আলো যা আছে সে আর এক মজা। অনেক দূরে দূরে আলো। পথ সবই প্রায় অন্ধকার, আলোতে কোনই কাজ হচ্ছে না। লণ্ঠনগুলোয় খুব কারুকার্য্য—খুব দামী লণ্ঠন, কিন্তু যা-কিছু শোভা বাইরেই।

মণ্টু বলল, "তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করছ না, আমরা রাত্রি বেলা এই শহরে ঢুকেছি।"

রাত্রিকে রাত্রি ব'লে আবিষ্কার করায় কোনো বাহাদুরি থাকতে পারে না, কিন্তু মণ্টু এক হিসেবে যা বলেছে তাতে ওকে প্রশংসা করতে হয়। মানে আমরা পর্বতগহ্বরে থেকে রাত্রি কি দিন সেটা বুঝতে পারছিলাম না, সুতরাং বেরিয়ে এসেই সেটা একবার আমাদের খেয়াল করা উচিত ছিল।

শহরের আলোর এই ব্যবস্থা দেখে আমি বললাম, "এরা বোধ হয় খুব নির্বোধ।"

মণ্টু আমার কথার প্রতিবাদ ক'রে বলল, "নির্বোধ

নাও হ'তে পারে। হয় তো তারা অত্যন্ত চতুর—কিছুই তো তাদের সম্বন্ধে জানি না।

প্রশ্ন করলাম, "কি ক'রে বুঝলে ?"

মণ্টু বলল, "বুঝিনি ব'লেই বলছি।"

আমি বললাম, "এরা নির্বোধ না হয়ে যায় না। বুদ্ধিমান হ'লে লণ্ঠনের চেয়ে আলোর ব্যবস্থাই বেশি ভালো করত।"

আমরা এই সব বলাবলি করছি এমন সময় দেখলাম, একটি লোক পাহারাওয়ালার বেশে পথের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার হাতে একখানা লম্বা লাঠি, লাঠির মাথায় একখানা কাগজ বাঁধা। পাহারাওয়ালা সেই কাগজখানা সবার বাড়ির সামনে একবার ক'রে দেখিয়ে যাচ্ছে।

সে পথে চলছে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে, তার পায়ে কোনো জোর নেই, মনে কোনো উৎসাহ নেই, তার কাজের মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য নেই, লক্ষ্য নেই, যেন বহু দিনের অভ্যাস বশে কর্তব্য ক'রে যাচ্ছে।

দেখলাম সকল বাড়ির দরজাই বন্ধ, তবে ঐ কাগজ দেখাচ্ছে কাকে ? মনে বড় কৌতূহল হ'ল। একটু এগিয়ে গিয়ে লোকটাকে ডাকলাম। তিনজন নতুন লোক দেখে লোকটি প্রথমে খুব ভড়কে গেল, তারপর চীৎকার ক'রে লাঠি খানা ফেলেই ছুটে পালিয়ে গেল। এ রকম নিস্তেজ একটি লোক যে এত জোরে ছুটে যেতে পারে তা কল্পনাই করতে পারিনি। মণ্টু বলল, "দেখে মনে হচ্ছে সামনে

এগিয়ে চলার জোর এদের নেই, কিন্তু ভয়ে পিছিয়ে যাবার জোর এদের খুব বেশি।”

আমারও তাই মনে হ’ল। কিন্তু একটি মাত্র লোককে দেখে সবার সম্বন্ধে আগে থাকতেই কিছু বলতে আমার ইচ্ছে হ’ল না। তাই চুপ ক’রেই রইলাম।

এগিয়ে গেলাম সেই লাঠির দিকে। গিয়ে দেখি এক মজার ব্যাপার! লাঠির মাথায় যে কাগজ বাঁধা ছিল তাতে লেখা আছে, “হে গৃহস্থ, সাবধানে ঘুমোও—সজাগ থাক—চোরের হাত থেকে বাঁচো।”

এবারে নিতাই বলল, “এরা নিশ্চয় আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত, এদের ক্ষমতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি।”

মণ্টু বলল, “কি ক’রে বুঝলে?”

নিতাই কাগজখানার দিকে আঙুল নির্দেশ ক’রে বলল, “দেখছ না, এখানকার লোকেরা ঘুমন্ত অবস্থাতেও সব পড়তে পারে?”

মণ্টু সে কথা বিশ্বাস করতে পারল না, আমিও পারলাম না। আমার সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। সত্যিই মনে হ’ল আসল কাজের চেয়ে, কাজের নিয়মটাকেই এরা বড় ক’রে দেখে। এদের কোথায় যেন কি একটা গোলমাল আছে।—এদের সঙ্গে ভালো ক’রে মিশে সব জানতে হবে। এদের বুদ্ধি সম্বন্ধে মণ্টুর মনেও সন্দেহ জেগে উঠছে।

বেশ বোঝা গেল আমরা শেষ রাত্রে এদের দেশে এসে

পড়েছি, রাতটা না কাটলে কোনো সুবিধাই হবে না, কিন্তু কোথায় রাত কাটানো যায়? যেখানে-সেখানে ঘুমিয়ে পড়া ঠিক নয়, তা ছাড়া সবাই এক সঙ্গে ঘুমোনও ঠিক নয়। এ দিকে ক্ষিধে যা পেয়েছে তা আর ব'লে লাভ কি? নিতাই তো পেটে হাত দিয়ে প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি! বলল, যা হোক কিছু খেতে হবে, চুরি ক'রেও যদি হয় তাতে আপত্তি নেই।

ক্ষিদে আমারও খুব পেয়েছিল, তাই সবাই মিলে পরামর্শ করতে লাগলাম কি করা যায়। মণ্টু বলল, "এদের এই শহরটি ঘুরে ঘুরে দেখা যাক যদি কোথায়ও খাবারের দোকান মেলে। কিন্তু এই রাত্রে ঘোরা কি সহজ কথা?

এই ভাবে এক জায়গায় ব'সে ব'সে আলোচনা করতে করতেই রাত্রি শেষে ভোরের অস্পষ্ট আলোকে সামনেই দেখতে পেলাম একটা দোকানের বাইরে লেখা আছে, "খাদ্য শিল্পালয়"।

নিতাই আবার ব'লে উঠল, "এরা আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত।"

মণ্টু আবার প্রতিবাদ ক'রে বলল, "কেন?"

নিতাই বলল, "দোকানের নাম দেখে। দেখছ না, কেমন নতুন ধরনের নাম?"

নাম দেখে আমিও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আশে পাশে চেয়ে দেখি, আরও অনেকগুলো খাবারের দোকান, এব

প্রত্যেকটি দোকানেব গায়েই ঐ রকম সব নাম লেখা। কতকগুলো নাম কবিতায় লেখা, কতকগুলোর কোন মানেই করা গেল না, সেগুলো গভীর ভাবপূর্ণ নাম।

নিতাই একটা নাম পড়ল, 'বাঁচতে যদি চাও—এই দোকানে খাও'—এবং বলল, "এরা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে উন্নত।"

মন্টু এবারে খুব চটে গিয়ে বলল, "তুই থাম্ নিতাই, বাজে কথা আর শুনতে চাই না। ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে, এখন আর কারও উন্নতি দেখবার সময় নেই।"

গোলমাল শুনে অনেকগুলো লোক 'চোর চোর' ব'লে চীৎকার করতে করতে আমাদের দিকে এগিয়ে এল।—তাদের প্রত্যেকের হাতে লাঠি। বোধ হয় যে পাহারাওয়ালা আমাদের প্রথম দেখেছিল সেই গিয়ে এদের সঙ্গে ক'রে এনেছে।

এদের প্রত্যেকেই খুব রোগা এবং মনে হ'ল প্রত্যেকেই খুব ভীরু। কেবল দলের সর্দারটিকে বেশ বলবান এবং সাহসী ব'লে মনে হ'ল। তার গায়ে নানা রঙের পোষাক। সে বেশ সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, "তোমরা কে?"

আমি বললাম, "আমরা বিদেশ থেকে তোমাদের দেশ দেখতে এসেছি।"

"দেশ দেখতে এসেছ, না চুরি করতে এসেছ?"

"চুরি করতে নয়। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, তাই খাবারের দোকানে কিছু পাওয়া যায় কি না দেখছিলাম।"

সর্দার গম্ভীরভাবে বলল, "হুঁ! কিন্তু গোলমাল করছিলে কেন?"

"চোর হ'লে গোলমাল করতাম না। আমরা যে চোর নই, গোলমালটাই তার একটা প্রমাণ।

"কেন গোলমাল করছিলে বল।"

একটা তর্ক বেধে উঠেছে আমাদের মধ্যে।"

সর্দার আরও গম্ভীরভাবে বলল, "হুঁ!" তারপর কিছুক্ষণ থেমে বলল, "কিন্তু তর্ক করতে তো বুদ্ধি চাই—তোমাদের কি বুদ্ধি আছে?"

নিতাই খুব গর্বিতভাবে বলল, "কিছু আছে বৈ কি!"

সর্দার আবার বলল "হুঁ।" তার মুখ এবারে আরও গম্ভীর হ'য়ে গেল। সে খুব চিন্তিতভাবে হাত নেড়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, "তোমরা এদেশে এলে কি ক'রে?"

মণ্টু এ কথার জবাব দিল। সে বলল, "বুদ্ধি থাকলেই আসা যায়।"

সর্দার কিছুক্ষণ মণ্টুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, "বুদ্ধির কথা কিছু ব'লো না। যদি বেঁচে থাকতে চাও তা হ'লে চুপ ক'রে থাক। কেন জান? বুদ্ধির কথা বললে আমরা তা সহ্য করতে পারি না; যে বলে, তাকে আমরা মেরে ফেলতেও পারি। কত লোক বাইরে থেকে আমাদের দেশে এসেছে, এবং এসেই নানা রকম উপদেশ দিতে চেয়েছে, কিন্তু তাদের আমরা উপযুক্ত শাস্তিও দিয়েছি।

আমি বললাম, "তা হ'লে আমরা চুপ ক'রে থাকব, কিন্তু কোনো কিছু বুঝতে না পারলে বুঝিয়ে দেবে তো ?"

সর্দার বলল, "তোমরা ছেলেমানুষ, তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই, তা ছাড়া তোমাদের দেখে আমার মনটা বদলে গেছে। তোমাদের উপর কেমন যেন একটা মায়াও জন্মে গেছে—তাই আমার হাতে তোমাদের কোনো অনিষ্ট হবে না। কিন্তু আমাদের রাজার কাছে তোমাদের একবার যেতেই হবে, এটা আমাদের দেশের একটা নিয়ম।"

সর্দারের কথায় আশ্বস্ত হ'য়ে বললাম, "তুমি যে রকম বলবে, আমরা সেই রকমই চলব। তা হ'লে চল এখন তোমার সঙ্গেই যাওয়া যাক।"

সর্দার তার সঙ্গের লোকগুলোকে বিদায় ক'রে দিয়ে একা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। চলতে চলতে খাওয়ার কথাটা আমরা যেন ভুলেই গেলাম। রাত্রি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে এল, পূব দিকে দিনের আলো জেগে উঠল।

আমি ভাবতে লাগলাম, এ কোথায় আমরা এলাম বাড়ি-ঘর ছেড়ে! কোথায়, কতদূর! আর কখনো কি ফিরে যেতে পারব ? কত পাহাড় বন, কত নদী মাঠ পার হ'য়ে এসেছি এই নতুন-দেশে! আবার কেমন ক'রে ফিরব কে জানে! যে পথে এসেছি সে পথে তো আর ফেরা যাবে না। যেখানে বাঘ ব'সে ব'সে তপস্যা করেছ সেখানে গেলে পাহাড়ের গা বেয়ে আমরা উঠতে পারব না, কাজেই নতুন

পথ খুঁজতে হবে। এই সব কথাই কেবল মনে আসতে লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, নতুন দেশে এসেই ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছি কেন! যখন এসেই পড়েছি তখন এ দেশটা ভাল ক'রে দেখে তবে যাব। যদি কষ্ট হয়, আমাদের তিন জনেরই হবে। যদি বিপদে পড়ি তা হ'লে বাঘকে ডাকলেই সে এসে আমাদের বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেবে।

একমাত্র ভয় নিতাইকে নিয়ে। নিতাই নিতান্তই ছেলেমানুষ। ও যে আমাদের সঙ্গে কেন এল বুঝতে পারছি না। যে কোনো জিনিস দেখলেই ও ভয়ে অস্থির হ'য়ে পড়ে। তবে মণ্টু খুব সাহসী। আমার একমাত্র জোর মণ্টুর জন্যে।

নিতাই আমাদের বলল, "এই নতুন দেশের লোকেরা যদি আমাদের মেরে ফেলে!"

মণ্টু একথা শুনে বিরক্ত হ'ল। সে বলল, "মেরে ফেললে তো আপদ চুকেই গেল।"

নিতাই বলল, "দেখ্ মণ্টু, তুই আমাকে ভয় দেখাস্‌নে। বেশি ভয় পেলে আমি কিন্তু হেঁটে যেতে পারব না।"

এই কথায় এবারে আমার ভয় হ'ল। বললাম, "না নিতাই, এরা আমাদের কোনো অনিষ্ট করবে না। দেখছ না, সর্দার আমাদের সঙ্গে কেমন ভাল ব্যবহার করছে! অন্য কেউ যদি আমাদের আক্রমণ করে, তাহ'লে সর্দারই আমাদের বাঁচিয়ে দেবে, সর্দারও যদি না পারে তা হ'লে বাঘ আছে!"

নিতাই বলল, "বাঘ তো আছে অনেক দূরে—তাকে তখন ডাকবে কে ?"

নিতাই কথাটা ঠিকই বলেছে। ভয়ে ওর বুদ্ধি খুলে গেছে। আমরা আগে কেউ এ কথাটা ভাবিনি।

মণ্টু বলল, "আমার কিন্তু বিশ্বাস, বাঘকে অতদূরে ডাকতে যেতে হবে না।"

নিতাই বলল, "আমারও তাই বিশ্বাস।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার এই বিশ্বাস কি ক'রে হ'ল ?"

মণ্টু বলল, "বাঘ যে তপস্যা করছে তাতে ও মনে মনে ধ্যান ক'রে সব জানতে পারবে। আমরা যদি কোনো বিপদে পড়ি, আর সে সময়ে বাঘকে মনে মনে ডাকি, তা হ'লে বাঘ বুঝতে পারবে।"

মণ্টুর কথাটা উড়িয়ে দেওয়া গেল না। আমিও ভেবে দেখলাম কথাটা হয় তো মিথ্যা নয়। কিন্তু তখনি আর একটা কথা মনে জাগল। আমরা মাত্র তিনজন, এই তিনজনে আমরা বেশি লোকের আক্রমণ ঠেকাব কি ক'রে ? পাঁচ-ছ'জনকে পর্যন্ত বাঘ ঠেকাতে পারবে,—দু'চারশো হ'লে কি হ'বে ?"

মণ্টু বলল, "তা হ'লেও আমাদের ভয় নেই, বাঘ সব অবস্থাতেই আমাদের বাঁচাতে পারবে।"

সর্দার আমাদের আগে আগে চলছিল, আমাদের কথা সে শুনতে পাচ্ছিল না।

মন্টুর কথায় আমার মনে হ'ল যেন কথাটা সে একটু বাড়িয়ে বলল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এ বিশ্বাস তোমার কি ক'রে হ'ল ?"

মন্টু বলল, "ঐ একই কারণে। বাঘ তপস্যা করছে এবং তার ফলে একা বাঘ হাজার বাঘের শক্তি লাভ করবে।"

কথাটা শুনে সত্যিই অবাক হ'য়ে গেলাম। মন্টুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, তপস্য করলে এত ক্ষমতা লাভ হয় কি ক'রে জানলে ?"

মন্টু সহজভাবেই বলল, "আমার তাই বিশ্বাস, তপস্যা করলে সবারই ক্ষমতা বাড়ে। তারা তখন যা ইচ্ছে করতে পারে। তা ছাড়া আমি এ বিষয়ে অনেক গল্প পড়েছি।"

এ নিয়ে আর তর্ক করলাম না। মন্টু যদি তার বিশ্বাস নিয়ে সুখে থাকে থাক। তবে অসম্ভব কিছুই নেই, এইটে আমার জানা ছিল। কি জানি হ'তেও পারে।
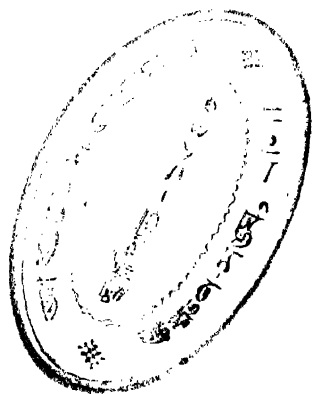
পঞ্চম অধ্যায়

সর্দারের সঙ্গে

আমরা এতক্ষণ যে কতটা পথ হেঁটেছি তা খেয়ালই নেই, পায়ে এত ব্যথা হয়েছে যে হাঁটিতে খুব কষ্ট হচ্ছে। সর্দারকে বললাম, "এইবার চলতি পথে আমাদের শহরটা বেশ ভালো ক'রে দেখিয়ে দাও।"

সর্দার বলল, "চলতি পথে শহর দেখানো যাবে না। শহর দেখতে গেলে বেশ ক'রে ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে। দেখতে সমস্ত দিন লাগবে। পারবে অতটা হাঁটতে?"

আমরা পায়ের ব্যথা সত্ত্বেও রাজি হ'লাম হাঁটতে। বেলা এতক্ষণে সাতটা কি আটটা হবে। পথে লোক চলাচল আরম্ভ হয়েছে। পথের লোকেরা আমাদের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে আছে। কেউ কেউ ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে! একপাল ছেলেমেয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মজা দেখবার জন্যে। কেউ কেউ আমাদের গায়ে ঢিল ছুঁড়ছে, কিন্তু সর্দারেব ভয়ে কেউ কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না।

সর্দার বলল, "আমাদের এই শহরের লোকগুলো বড় ভাল, আমাকে খুব মেনে চলে।"

ভাল লোকের নমুনা দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম। লোকগুলো এত নোংরা আর অসভ্য যে কি বলব!

সর্দার বলল, "শহরের বাইরে একদল লোক আছে তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লাগে তা হ'লে একটু ভয়ের কথা। তারা আমাকেও বড় একটা মানে না। তারা কোনো আইনই মানে না, যখন যা খুশী তাই করে, রাজাও তাদের খুব খাতির ক'রে চলেন। কিন্তু যাক, এ সব কথা আর আলোচনা করব না, যখন যেমন হয় তাই বুঝে ব্যবস্থা করব।"

আমরা বুঝতে পারলাম, আমাদের এই ভ্রমণ-ব্যাপারটা খুব নিরাপদে শেষ হবে না। অনেকগুলো নতুন ধরনের বিপদ আমাদের সামনে যে আসবেই এ বিষয়ে আমাদের আর কোনো সন্দেহ রইল না। হঠাৎ এখন ফিরে যাবারও উপায় নেই। বিপদ উত্তীর্ণ হ'তে পারব কি না সেইটেই হ'ল সমস্যা। মন ভয়ে ভ'রে উঠল, অথচ বাইরে কিছুই প্রকাশ করতে পারলাম না।

এই সময় আর একটু এগিয়ে যেতেই হঠাৎ দেখি পথের ধারে একটি লোককে সবাই মিলে শাস্তি দিচ্ছে। এমন নিষ্ঠুরতার দৃশ্য এর আগে কোথায়ও দেখিনি। কালিপূজোয় যেমন সবাই মিলে উৎসব ক'রে পশুবলি দেয়—এখানেও সেই রকম বহু লোকের উৎসবের মধ্যে একটা মানুষকে যেন বলি দেওয়া হচ্ছে।

প্রকাণ্ড এক আসর বসেছে পথের ধারে। অনেক রকম বাজনা অনেক লোক এক সঙ্গে বাজাচ্ছে। একটু এগিয়ে

ভাল ক'রে ব্যাপারটি দেখতে লাগলাম। যাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে সে সবাইকে ভেংচি কাটছে আর দু'খানা হাতে ক্রমাগত শূন্যে ঘুঁসি ছুঁড়ছে। যে সব বাজনা বাজছে তার

তালে তালে সে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, হাঁ ক'রে গলা কাঁপাচ্ছে, এবং উপস্থিত সবাইকে কি যেন বলতে যাচ্ছে কিন্তু গলা থেকে কেবল একটা অস্পষ্ট ভাঙা আওয়াজ বেরুচ্ছে, কোনো

কথা বেরুচ্ছে না। তার কপাল থেকে বৃষ্টির মতো ঘাম ঝরছে, সেই ঘামে তার সকল গা ভিজে যাচ্ছে।

কি তার অন্যায় যার জন্য এই নিষ্ঠুর শাস্তির ব্যবস্থা! আসরের লোকগুলো কি নিষ্ঠুর! লোকটির যত কষ্ট হচ্ছে ততই তারা আনন্দে চীৎকার করছে!

কিন্তু সর্দার আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত ক'রে বলল, "লোকটি একজন বিখ্যাত ওস্তাদ গাইয়ে। তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না, সে ঐ আসরে ব'সে গান গাইছে।"—

আমি স্তম্ভিত হ'য়ে প্রশ্ন করলাম, "গান গাইছে, তা হ'লে গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না কেন?"

সর্দার আমার প্রশ্ন শুনে বলল, "গানের ঐ টুকুই তো আসল।"

মণ্টু উত্তেজিতভাবে বলল, "ঐ টুকুই আসল, তার মানে? কণ্ঠ নেই তবু গান?—গান যেন আমরা কখনো শুনিনি!"

সর্দার বলল, "উত্তেজিত হয়ো না, শোন। গান গাইতে গাইতে প্রথম গলা ভেঙে যাবে, তারপর গলায় পাঁচ সাতটা সুর একসঙ্গে বেরুবে, তারপর খালি সোঁ সোঁ আওয়াজ বেরুবে—শুনে মনে হবে হাঁপানি হয়েছে।—তারও পরে সব বন্ধ, কোন আওয়াজই বেরুবে না, কিন্তু ভেংচি কাটা, ঘাড় ঝাঁকানো এ সব ঠিক রাখতে হবে। আর তখন হবে সে ওস্তাদ শিরোমণি।"

"বল কি সর্দার!"

"হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি, আর যারা গান বোঝে তারাও ঐ কথাই বলে। তারা বলে গানে ঐ সবেরই দাম, আর কিছুর দাম নেই।"

মণ্টু প্রশ্ন করল, "তা হ'লে যারা বাজাচ্ছে তাদের বাজনার শব্দ হচ্ছে কেন?"

সর্দার বলল, "সে কথা আর এক সময় বুঝিয়ে দেব, তবে আপাতত এইটুকু মনে রাখ যে সঙ্গীত একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার, চট্ করে এর মানে বোঝা যাবে না।"

সর্দারের কথায় আমাদের আর কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস হ'ল না। কেবল নিতাই অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল, "তা হ'লে যে-কোনো লোক হাত নাড়লে আর ঘাড় ঝাঁকালে তোমাদের দেশে ওস্তাদ গাইয়ে হ'তে পারে?"

সর্দার গম্ভীর গলায় বলল, "মোটেই তা নয়, ওস্তাদ হওয়া যার তার কাজ নয়। ঐ হাত নাড়া আর ঘাড় ঝাঁকানো তুমি সহজ মনে করছ? সহজ নয়, ভয়ানক কঠিন। আমি যদি ঐ রকম মিনিট দশেক করি তা হ'লে আমার সর্বাঙ্গে ব্যথা ধ'রে যাবে, নড়বার শক্তি থাকবে না।—বছর-দশেকের অভ্যাস না থাকলে ও রকম করা যায় না।"

নিতাই কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়ল। ভয়ে নয়, ক্ষুধায়। কাতর কণ্ঠে নিতাই বলতে লাগল, "আর যে দাঁড়াতে পারছি না সর্দার, খিদেয় পেট জ্বলে গেল।"

কিন্তু আমরাও যে কোন্ মন্ত্রবলে এতক্ষণ সোজা ছিলাম তা জানি না, হঠাৎ নিতাইয়ের কথা শুনে মনে হ'ল আমাদেরও পায়ে কোনো জোর নেই। আমরাও সর্দারকে আমাদের অবস্থা জানালাম। সর্দার তাদের শহরের হোটেল পাড়ায় নিয়ে গেল আমাদের।

পাড়াটা ছোট নয়। সারি সারি হোটেল। বহু লোকের ভীড়। কেউ খেয়ে বেরিয়ে আসছে, কেউ ঢুকছে। এই পাড়ায় হোটেল ভিন্ন অন্য কোনো বাড়ি আছে ব'লে মনে হ'ল না; কিন্তু একটা জিনিস দেখে ভারি মজার মনে হ'ল। সবসুদ্ধ প্রায় পঁচিশটি হোটেল, কিন্তু কোনোটির গায়েই 'হোটেল' কথাটি লেখা নেই। কোনোটির গায়ে 'বিশুদ্ধ'—আবার কোনোটির গায়ে 'পবিত্র' কথাটি শুধু লেখা আছে। আগে যে খাদ্যশিল্পালয় দেখেছি সেটা মিষ্টান্নের দোকান।

একটা "বিশুদ্ধ" ঘরে গিয়ে ওঠা গেল। হোটেলের মালিক জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা কি খাবে—ভাত না রুটি না চা?"

আমরা ভাত খাওয়াই ঠিক করলাম, হোটেলের মালিক আমাদের তিনটে আসন দেখিয়ে দিল। চেয়ে দেখি আমাদের আগে যারা খেয়ে গেছে, তিনটে আসনে তাদের খাওয়া থালা পড়ে আছে, আর তারা ভাত ডাল তরকারী যা খেতে পারেনি তাও ঐ থালাগুলোয় পড়ে আছে। হোটেলের মালিক বলে কি! আরও বহু লোক সেই ঘরে বসে খাচ্ছিল, তারাও তার কথায় বিস্মিত হ'ল না!

আমি বললাম, "থালাগুলো তুলে নাও, ওখানে বসব কি ক'রে ?

আমার এই প্রশ্নে ঘরসুদ্ধ লোক আমাদের দিকে চেয়ে হেসে উঠল। ব্যাপার কি ? প্রশ্নটা যে অন্যায় হয়েছে এমন তো বোধ হ'ল না, তবে ওরা হাসল কেন ?

হোটেলের মালিক গম্ভীরভাবে (হয়তো তারও হাসি পেয়েছিল কিন্তু ব্যবসার খাতিরে হাসি চেপে) বলল, "থালা তুলে নেব কেন ? থালায় যা আছে খেতে থাক, আরও যদি লাগে চেয়ে নিও।"

বললাম, "এ কি রকম কথা ! আমরা পরের উচ্ছিষ্ট থালায় খাব না।"

এ কথায় হোটেলের মালিকও এবারে হেসে উঠল। তার ভাবখানা এই যে আমাদের মতো অদ্ভুত লোক সে এর আগে আর কখনো দেখেনি। সে হাসতে হাসতেই বলল, "দেখ তোমরা এই নতুন দেশে এসেছ, এখানে এসে এখানকার নিয়মটাই মেনে চল।"

সর্দার আমাদের কাছে বসে ছিল, সে হোটেলের মালিককে বলল, "এরা আমাদের লোক, এদের সঙ্গে ভাল ভাবে কথা বল।

এ কথায় হোটেলের মালিকের মুখখানা হঠাৎ ভাল মানুষের মতো হ'ল, সে মাথা চুলকিয়ে বলতে লাগল, "তোমরা যে রকম খেতে চাইছ, আগে আমরা সেই রকমই দিতাম। কেউ খেয়ে উঠে গেলে, তার পাতের এঁটো ভাত

আড়ালে নিয়ে এক জায়গায় জড়ো করতাম, তারপর সেই-গুলোই নতুন থালায় সাজিয়ে নতুন লোককে দিতাম।—ক্রমে দেখা গেল সেই এঁটো ভাতই লোকে বেশি পছন্দ করছে। তারপর আস্তে আস্তে কথাটা সবার কানে গেল—আর ক্রমে আমাদের খদ্দের বাড়তে লাগল। আমাদের এখানকার সব হোটেলেই এখন এই ব্যবস্থা হয়েছে।

মন্টু প্রশ্ন করল, "এই যে এরা সব খাচ্ছে, এরা কি সবাই এঁটো ভাত খাচ্ছে?"

হোটেলের মালিক বলল, "শুধু এঁটো নয়, বাসীও বটে। সকালে যারা খেতে আসে তারা প্রায় সবাই কাল রাত্রে যারা খেয়ে গেছে তাদের এঁটো ভাত খায়।—আজ সেইটে গরম ক'রে দিয়েছি মাত্র।"

দেখলাম যারা খাচ্ছে তারা এ সব কথায় ভ্রূক্ষেপও করছে না। মন্টু অবাক হ'য়ে বলল, ভারি মজার লোক তো এরা।"

সর্দার ব'লে উঠল, "তোমরা এই সব বাজে কথায় অকারণ অনেক সময় নষ্ট করছ। আর কিছু প্রশ্ন ক'রো না, এইটে কেবল জেনে রাখ যে এরা এই রকম খেয়েই তৃপ্তি পায়—কেন পায় তা ভগবান জানেন। এদের আচার ব্যবহারের সঙ্গে পরিচয় হ'লে সব বুঝতে পারবে,—এখন যা হয় কিছু খেয়ে নাও।"

মন্টু বলল, "শুধু একটা প্রশ্ন বাকী রইল—এদের এই রকমই যদি প্রবৃত্তি, তা হ'লে হোটেলের গায়ে "পবিত্র" বা

"বিশুদ্ধ" লেখা আছে কেন?" কিন্তু সর্দারের দিকে তাকিয়ে তার আর উত্তর শোনবার ইচ্ছে হ'ল না, কেননা সর্দার ইতিমধ্যেই বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিল, আর তার সেই বিরক্তির ভাব তার চোখে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তার এই বিরক্তি দেখে আমার মনে হ'ল, তাদের দেশে এর চেয়েও অনেক ভাল ভাল জিনিস দেখবার আছে, অতএব একটা জিনিস নিয়ে অনেক সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। আমার এ ধারণাটা যে ঠিক তা পরে বুঝতে পেরেছিলাম।

নিতাই বলে উঠল, "ভাত খাব না, চা খাব।" বলতে না বলতেই তিন পেয়ালা চা এল—কোন রকমে তাই খাওয়া গেল, কিন্তু গোল বাধল দাম দেওয়ার সময়। তিন পেয়ালা চায়ের দাম শোনা গেল তিন টাকা। দিতে আমাদের সবারই আপত্তি হ'ল, মণ্টু বলল, এটা নিছক জোচ্চুরি—এক পেয়ালার দাম এক টাকা হ'তেই পারে না। কিন্তু সর্দার গোলমাল থামিয়ে দিয়ে বলল, "তোমাদের দাম দিতে হবে না, তোমরা আমার অতিথি, তোমাদের খরচ আমিই দেব।"

নিতাই বলল, "কিন্তু তাই ব'লে এত দাম হবে কেন?

সর্দার বলল, "সকালের চায়ের ঐ রকমই দাম এখানে; কিন্তু দামের কথা এখন থাক, চল, আমাদের বড্ড দেরি হ'য়ে যাচ্ছে—এখানে আর এক মুহূর্তও নয়।"

আমরা সর্দারের নির্দেশ মতে ··· েন থেকে রওনা হলাম। মণ্টু এই সব কথা তার ডায়েরিতে লিখবে ব'লে কল্পনা

করছিল, কিন্তু সকালে চায়ের দাম এক টাকা কেন এই সমস্যায় তার কাল্পনিক লেখাটাও আর এগোচ্ছিল না, তাই সে কাতরভাবে আমার দিকে চেয়ে বলল, "নতুন দেশে এসে কিছু ভাল ক'রে না জেনে মিছিমিছি ঘুরে বেড়িয়ে লাভ কি? তা হ'লে এত কষ্ট ক'রে এলাম কেন?"

খুব দুঃখ হ'ল মণ্টুর জন্যে, তা ছাড়া ওর উদ্দেশ্য যে খুব ভাল এতে তো আর সন্দেহ নেই, কাজেই মণ্টুর কথাটা ফেলা গেল না। চায়ের দাম সম্বন্ধে কথা পাড়তেই হ'ল, কিন্তু খুব ভয়ে ভয়ে, কি জানি যদি সর্দার চটে যায়। কিন্তু আমাদের ভাগ্যবশত সর্দার মোটেই চট্‌ল না বরঞ্চ আরও উৎসাহের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করল। আসলে, ব'সে ব'সে আলাপ করাতেই তার আপত্তি—চলতি পথে কোনো আপত্তিই নেই।

চায়ের দাম সম্বন্ধে সর্দারের সঙ্গে আলাপ ক'রে জানা গেল, সকালে যারা চা খেতে আসে তারা প্রায়ই পয়সার লোক, তারা বেশি দাম দিয়ে চা খেতে পারে, সুতরাং তাদের কাছ থেকে যতটা পারে আদায় ক'রে নেওয়া হয়। হোটেলে চায়ের পেয়ালা ধোয়ার জন্য প্রকাণ্ড এক বালতি জল রাখা হয়। একজন চা খেয়ে উঠে গেলে তার পেয়ালা সেই বালতির জলে ডুবিয়ে ধুয়ে নেওয়া হয়। এইভাবে একই বালতির জলে সকাল থেকে পেয়ালা ধুতে ধুতে সেই জল চায়ের মতো লাল হ'তে থাকে। তারপর বিকেলের দিকে সেই পেয়ালা ধোয়া জল বালতি থেকে নিয়ে গরম ক'রে চা ব'লে বিক্রি করা

হয়। এই বিকেলের চা খুব সস্তায় বিক্রি হয়—এক পেয়ালা দু'পয়সা। তা ছাড়া কেউ যদি সন্দেহ করে ঐ চা পেয়ালা-ধোয়া জল নয়, তা হ'লে সে ভিতরে চা তৈরির জায়গায় গিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারে। কেউ কেউ নাকি সন্দেহ করেছে এবং এখনও করছে, তাই সর্দার বলল, এখন থেকে ওরা নাকি কাপ ধোয়ার বালতিটা সবার সামনেই রাখবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাঠশালা ও ডাক্তারিদাঙ্গা

এই সব কথা শুনতে শুনতে আমরা এসে পড়লাম আর এক জায়গায়। শুনলাম এইখানে ওদের একটি বড় পাঠশালা আছে। কিন্তু কোথায় পাঠশালা চারদিকে তাকিয়েও কিছু বুঝতে পারা গেল না। সামনে গুদামের মতো একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু তাকে পাঠশালা ব'লে মনে করা সম্ভব হ'ল না। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা একটা কলরব শুনতে পাচ্ছিলাম কিন্তু সেই কলরবকে মানুষের কলরব না ব'লে মৌমাছির গুঞ্জন বললে ঠিক হয়, কেননা অনেক দূর থেকে এলেও আওয়াজটি ছিল তীক্ষ্ণ এবং মধুর।

সর্দার সেই গুদাম ঘরেই আমাদের নিয়ে গেল। ভিতরে গিয়ে বুঝতে পারলাম সেইটেই পাঠশালা আর আমরা যে কলরব শুনেছিলাম তা এখানকার ছাত্রদের কণ্ঠ থেকেই আসছিল। কিন্তু গুদাম ঘরে জানালা নামক কোনো বস্তু না থাকাতে মনে হচ্ছিল আওয়াজটি বহু দূর থেকে আসছে।

আমরা এগিয়ে পাঠশালার ভিতরে গেলাম। সর্দার আমাদের সঙ্গে ছিল, সে জন্য কেউ কিছু বলল না। আমরা দেখলাম গুরুমশাই একটি ছেলেকে প্রশ্ন করছেন—"বৃষ্টি হয় কি থেকে ?"

আমরা আসছি বাইরে থেকে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমাদের সম্বন্ধে কোন ছাত্রেরই কোনো কৌতূহল দেখলাম না, বাইরের লোক তাদের মধ্যে এসেছে, এটা যেন তারা দেখতেই পায়নি এমনি ভাবখানা।

আমরা অবাক হ'য়ে পড়ানোর ভঙ্গী দেখতে লাগলাম। গুরুমশাই প্রশ্ন করলেন, "বৃষ্টি হয় কি থেকে?"

যাকে প্রশ্ন করা হ'ল, সে নতুন ছাত্র, তখনও তার বই কেনা হয়নি, কিন্তু তবু সে এই প্রশ্নের উত্তরে বলল, "বৃষ্টি হয় মেঘ থেকে।"

গুরুমশাইয়ের চোখ ছুটো লাল হ'য়ে উঠল। রেগে বললেন, "কি ক'রে জানলে?"

ছেলেটি বলল, "আমি মেঘ থেকে বৃষ্টি হ'তে দেখেছি।"

এ কথায় গুরুমশাই গর্জন ক'রে লাফিয়ে উঠে ছেলেটিকে নিষ্ঠুর ভাবে বেত মারতে লাগলেন। ছেলেটি চীৎকার ক'রে কেঁদে বলতে লাগল, "মিছে কথা বলছি না গুরুমশাই, নিজে দেখেই বলছি।" কিন্তু এ কথায় কোনো ফল তো হ'লই না, উল্টে সে আরও বেশি ক'রে বেত খেতে লাগল।

ছেলেটির অবস্থা দেখে আমি তাকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সর্দার আমাকে টেনে এ'নে চুপে চুপে বলল, "চুপ ক'রে দেখে যাও, নইলে বিপদে পড়বে, এখানকার যে সব নিয়ম তা তোমাদের দেশের নিয়মের সঙ্গে মিলছে না বলেই অধীর হ'য়ো না, তা হ'লেই তোমাদের দেখা সার্থক হবে।"

সর্দারের কথায় থেমে গেলাম।

ছেলেটি মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে দুর্বল হ'য়ে পড়ল, তখন গুরুমশাই আসনে গিয়ে বসলেন। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে, কপালের ঘাম মুছে, এক ঘটি জল খেয়ে অন্য ছাত্রদের ডাকলেন। সবাই এল তাঁর কাছে। তিনি তখন তাদের বলতে লাগলেন, "দেখেছ এই নতুন ছেলেটির কাণ্ড! প্রশ্ন করলাম 'মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, কি ক'রে জানলে?' তার উত্তরে ও বলে কিনা, নিজে চোখে দেখেছে!"

শুনে ছেলেরা তো হেসেই অস্থির। তাদের হাসি আর থামে না। ওদের মধ্যে একটি ছেলে একটু গম্ভীর ছিল, সে নতুন ছেলেটির হাত ধ'রে তাকে মাটি থেকে তুলে বলল, "ও রকম উত্তর দিলে তো তোমার এখানে পড়া চলবে না। কেমন ক'রে গুরুমশাইয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় তাও জান না? তোমার বলা উচিত ছিল, 'বৃষ্টি হয় কি থেকে তা কি ক'রে জানব?' তুমি তো আর পাঠশালায় পড়নি। পাঠশালায় যখন পড়বে তখন বই থেকে সব জানতে পারবে। চোখে দেখে কিছু শেখা যায় না, শিখলেও তা ভুল শেখা হয়, যা বলবে বই থেকে মুখস্থ ক'রে বলবে।"

মার-খাওয়া ছেলেটি এই কথা শুনে খুব নরম সুরে বলল, "আমি তা হ'লে খুব অন্যায় ক'রে ফেলেছি, আর কখনো এ রকম বলব না।"

নতুন ছাত্রের এই দুর্দশা দেখে নিতাইএর চোখে জল এল।

সে চোখ মুছে আমাকে চুপে চুপে বলল, "চল, আর নয়—এ দেশ থেকে এখুনি চলে যাই।"

মণ্টু শুনে বলল, "না নিতাই, তা হয় না, এই অদ্ভুত দেশটি ভাল ক'রে না দেখে কিছুতেই যাওয়া যায় না।"

আমরা সবাই পাঠশালা থেকে বেরিয়ে বাইরে এলাম। সর্দার তখন বলল, "চোখে দেখা যতটা বন্ধ করা যায়, সেই জন্যই পাঠশালা গুদামে বসে।—এখানে জানালা নেই, তাতে অন্তত পড়ার সময় ছেলেরা বাইরে তাকিয়ে কিছু দেখতে পারে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমাদের দেশে পড়ানোর যদি এই নিয়ম তা হ'লে গুরুমশাইয়ের দরকার কি? ব'সে ব'সে বই মুখস্থ করা ছাড়া ছেলেদের তো আর কাজ নেই!"

সর্দার বলল, "গুরু মশাই না থাকলে ছেলেরা পড়া মুখস্থ করছে কি না তা দেখবে কে? তা ছাড়া ছেলেদের পাহারা দিতে হয়, ওরা যদি বই থেকে চোখ ফেরায় তা হ'লে যে পাঠশালার নিন্দা হবে।"

মণ্টু বলল, "তা হ'লে গুরুমশাই মানে চৌকিদার?"

সর্দার বলল, "ঠিক তাই। যাকে আমরা দেখলাম সে লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানে না। খুব সকালে সে একপাল গোরু নিয়ে মাঠে বেরিয়েছিল, মাঠে গোরু চরিয়ে পাঠশালায় এসে বসেছে। একটা মজার গল্প শোন। একখানা বইতে 'গোরুর চার পা' এই কথাটা ছাপার ভুলে 'গোরুর তিন পা'

হয়ে গিয়েছিল। গুরুমশাই পড়াতে লাগল গোরুর তিন পা। একটি ছেলে তার প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল, কিন্তু তখুনি গুরুমশাইয়ের বেত তাকে নীরব ক'রে দেয়। কারণ বইতে যা ছাপা আছে তাই সত্য, চোখে যা দেখা যায় তা সত্য নয়। সেই থেকে আর কেউ ছাপা বইয়ের কথার প্রতিবাদ করে না।"

আমি বললাম, "তোমাদের এই গুরুমশাইয়ের সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই। সর্দার গুরুমশাইকে সে কথা জানাতে তিনি আনন্দের সঙ্গে রাজি হ'লেন। আমাদের অনেক বিষয় আলাপ হ'ল। গুরুমশাইয়ের জ্ঞানের বহর দেখে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। একটা প্রশ্ন করেছিলাম, "আপনারা ইতিহাস কিছু পড়ান তো?" গুরুমশাই বলেছিলেন, "ইতিহাঁস মানে কি? (ইতিহাঁসের চন্দ্রবিন্দুটা তিনিই যোগ করেছিলেন)।—অ্যাঁ, ইতিহাঁস মানে কি?—
—আমি এক রকম হাঁসের নাম জানি সেটা পাতিহাঁস—
ইতিহাঁস তো কখনো শুনিনি!"

আমি আর কি বলি! কিন্তু আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে গুরুমশাই বললেন, "বল না হে, ইতিহাঁস দেখতে কেমন?" আমি বললাম, "পাতিহাঁসের মতোই দেখতে, তবে তার মাথাটা অনেকটা আপনার মতো, দুটো শিংও আছে কিন্তু দেখা যায় না। গুরুমশাই খুব খানিকটা হেসে বললেন, "ভারি মজা তো।"

আমি বললাম, "মজা ব'লে মজা! তাকে দেখলেই হাসি পায়।"

গুরুমশাই হাসতে হাসতেই বললেন, "কিন্তু এ রকম হাঁস তোমরা পড় কি ক'রে? হাঁস কি কেউ পড়ে?"

"সে কথা আর শুনবেন না গুরুমশাই, আমাদের দেশে সবই অদ্ভুত।"—কিন্তু আর বলা হ'ল না, এই সময় হঠাৎ একটা ভীষণ গোলমাল আমাদের কানে এল। ছুটে বেরিয়ে গিয়ে দেখি পথে লাখ লাখ লোক দাঙ্গা বাধিয়েছে। আমাদের পাশ দিয়ে বহু লোক ছুটে যাচ্ছে সেই দিকে। ব্যাপার কি?

সর্দার ভীতভাবে বলল, "নিশ্চয় সেই লোকটির অসুখ করেছে।"

"এ কথার মানে কি? সেই লোকটি কে? আর তার অসুখ করলেই বা এত দাঙ্গা বাধে কেন?"

সর্দার গম্ভীর সুরে বলল, "আমাদের দেশে এই বিপদ। এই শহরে পাঁচ হাজার বয়স্ক পুরুষ লোক আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ৪৯৯০ জনই ডাক্তার। বাকী দশজনের মধ্যে আমি একজন। শহরের মোট বারো হাজার লোকের মধ্যে এত ডাক্তার থাকলে কারোই রোগী পাবার উপায় নেই—কেননা সব বাড়িতেই দু'এক জন ক'রে ডাক্তার আছে। এই শহরে বাইরে-থেকে আসা একটিমাত্র লোক আছে যে ডাক্তার নয়। সব ডাক্তার সব সময় লক্ষ্য রাখে এই লোকটির অসুখ হয় কি না। এক মাস আগে একদিন তার জ্বর হয়েছিল, তা শুনে

৪৯৯০ জন ডাক্তারই একসঙ্গে ছুটে গিয়েছিল তার চিকিৎসা করতে। কিন্তু এত ডাক্তার গিয়ে দাঁড়াবে কোথায়? তাই পথে তাদের মধ্যে লাগল মারামারি। সে এক মজার দৃশ্য! ডাক্তারি যন্ত্র দিয়ে এ ওকে মারছে, ও তাকে মারছে। কেউ স্টেথোস্কোপ দিয়ে একজনের গলায় ফাঁস লাগিয়েছে, কেউ ইনজেকশনের সূঁচ একজনের গায়ে ফুটিয়ে দিচ্ছে, কেউ মুঠো ভরা কুইনিন একজনের মুখে গুঁজে দিচ্ছে, কেউ ফোঁড়া কাটা অস্ত্র দিয়ে একজনের গলা কাটছে—সে এক মারাত্মক কাণ্ড!

"এই সব ডাক্তারদের বীভৎস চীৎকার আর আর্তনাদ শুনে রোগীর জ্বর গেল ছেড়ে! সে বিছানা থেকে উঠে দেখে হাজার হাজার ডাক্তার তার জন্য প্রাণ দিচ্ছে। দেখে তার দয়া হ'ল, কিন্তু কাছে গিয়ে তার কিছু বলতে সাহস হ'ল না—ক্ষীণ কণ্ঠে হাজার হাজার উত্তেজিত ডাক্তারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা তার পক্ষে ছিল সত্যিই অসম্ভব। তাই সে বুদ্ধি খাটিয়ে একটা গাছে উঠে সবাইকে ডেকে বলল—"এই দেখ—তোমরা যে রোগীর জন্য মারামারি করছ, আমি সেই রোগী; তোমাদের চীৎকারে আমার রোগ সেরে গেছে। কিন্তু যদি তোমরা এখন না থাম এবং আরও চীৎকার কর তা হ'লে আমি গাছ থেকে লাফিয়ে প'ড়ে ম'রে যাব। দেব লাফ?"

"এ কথা শুনে ৯৯৯০ জন ডাক্তার ভয়ে কাঁপতে লাগল। তাই তো, যদি সত্যিই লোকটি প'ড়ে মরে যায় তা হ'লে ভবিষ্যতে তারা আর একটিও রোগী পাবে না! এইটে বুঝতে

পেরে সবাই মিলে তাকে অনুনয় বিনয় করতে লাগল, অনেকে গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগল। সেই কান্না আর তাদের অসহায় ভাব দেখে রোগীর মন ভিজল। তার কাছে একটি টাকা ছিল, সেইটে সে নীচে ফেলে দিল ডাক্তারদের মধ্যে। ডাক্তাররা আনন্দে চীৎকার করতে করতে টাকাটা কুড়িয়ে নিয়ে বখরা করতে বসল, ঠিক হ'ল সবাই সমান ভাগ পাবে। কিন্তু একটি টাকাকে ৪৯৯০ ভাগ করা গেল না। তারা তখন সবাই মিলে গেল পাঠশালার গুরুমশাইয়ের কাছে। কিন্তু গিয়ে দেখে গুরুমশাই সেখানে নেই।

"তখন ডাক্তারদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে বলল, "গুরুমশাইকে পাঠশালায় পাবে কেন? তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন—অর্থাৎ আমিই তিনি। আমিও যে ডাক্তার সেটা তোমরা ভুলে গিয়েছ, তাই এতক্ষণ মজাটা দেখছিলাম।"

সবাই তখন গুরুমশাইকে বলল টাকাটাকে ৪৯৯০ ভাগে ভাগ ক'রে দিতে। গুরুমশাই পাঠশালায় ঢুকে অঙ্কের বই খুলে অনেকক্ষণ ধ'রে উল্টে পাল্টে বললেন, "সে হবে না, বইতে নেই।"

"ডাক্তারদের মধ্যে এক চাল-বিক্রেতা ছিল, সে বলল এক টাকার চাল কেনো, আমার দোকানে চল, আমি এক টাকায় ৪৯৯০টি চাল দেব, এই চাল প্রত্যেকে একটি ক'রে নিলেই হবে। শেষে তাই ঠিক হ'ল। ডাক্তাররা সবাই একটি ক'রে চাল নিয়ে ঘরে গেল।"

সর্দার এই কাহিনীটা শুনিয়ে বলল, "আজ বোধ হয় আবার সেই লোকটির অসুখ করেছে এবং আবার ডাক্তাররা তার চিকিৎসার জন্য মারামারি করছে।"

মণ্টু জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা এরা ডাক্তারি শিখেছে কোথাও ?"

সর্দার বলল, "ডাক্তারি আবার কোথাও শিখতে হয় নাকি ? কৈ আমি তো জানি না। তোমাদের দেশে হয় তো হয়, কিন্তু আমাদের দেশে জ্ঞান হবার পর থেকেই প্রায় সবাই ডাক্তার। তুমি আমাদের দেশে কারো কাছে যদি একবার বল তোমার মাথা ধরেছে বা জ্বর হ'য়েছে, তা হ'লেই বুঝতে পারবে ডাক্তার কাকে বলে। তোমরা কেউ এই রকম মারাত্মক ভুল কখন ক'রো না যেন, করলে আমি কিন্তু তোমাদের তখন রক্ষা করতে পারব না।"

শুনে আমরা সবাই ভয়ে কেঁপে উঠলাম।

সপ্তম অধ্যায়

অদৃশ্য জন্তু

দূরে দাঁড়িয়েই ডাক্তারদের মারামারি দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ দেখি ডাক্তারেরা একে একে অজ্ঞান হ'য়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। এ আবার কি হ'ল? সর্দারও কিছু বুঝতে পারল না। গত বারে যে মারামারি হয়েছিল তাতে নাকি এ রকম দলবেঁধে তারা অজ্ঞান হয়নি! তা হ'লে এবার নিশ্চয়ই নতুন কিছু বিপদ হয়েছে। সর্দারের সঙ্গে আমরা সেই ডাক্তারের গাদা ঠেলে চলতে লাগলাম। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই দেখি একটি লোক চীৎকার ক'রে বলছে, "আমিও ডাক্তার হয়েছি, আমিও ডাক্তার হয়েছি।" সর্দার তাকে প্রশ্ন ক'রে জানতে পারল সেই লোকটিই রোগী। তাকেই চিকিৎসা করার জন্য ডাক্তারদের ভীড় হয়েছিল। কিন্তু এবারে রোগী নিজেই ডাক্তার হ'য়ে পড়েছে, কারণ গতবারের মতো সে আর একটি টাকাও এবারে নষ্ট করতে রাজি নয়। তাকে দায়ে পড়েই ডাক্তার হ'তে হয়েছে, আর এ রকম মর্মান্তিক খবর শুনে ডাক্তারদের মতো কঠিন লোকও যে মূর্ছিত হ'য়ে পড়বে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

আমরা কিন্তু বিস্মিত না হ'য়ে পারলাম না। ৪৯৯০ জন ডাক্তারের গাদা একটা দেখার মতো জিনিস।

সর্দারকে বললাম, "সর্দারজি আমরা যে-দেশ থেকে এসেছি সেখানে সব দৃশ্যই অতি মধুর। বাংলাদেশের সেই মধুর এবং স্নিগ্ধ দৃশ্য দেখে দেখে মন কেমন যেন একটা মোহে আবিষ্ট হ'য়ে আছে, সেই মোহ এখন মন থেকে দূর করতে চাই। আমার মনে হচ্ছে ডাক্তারদের স্তূপের এই দৃশ্যটি আমার মনকে সজীব ক'রে তুলছে, মনের মুগ্ধ ভাবটা যেন দূর হ'য়ে যাচ্ছে, এ দৃশ্য থেকে আমি চোখ ফেরাতে পারছি না—তুমি একটু দাঁড়াও সর্দারজি, আমি এ দৃশ্যটি মনভ'রে দেখে নিই।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সর্দার আমার কথায় রাজি হ'ল। আমি সেইখানে ব'সে পড়লাম, মণ্টুও একটু দূরে ব'সে ডায়েরি লিখতে লাগল। নিতাই কিন্তু বসল না, সে ডাক্তারদের খুব কাছে গিয়ে তাদের চোখমুখ ভাল ক'রে দেখতে লাগল। সর্দার দূরে বসে রইল।

মিনিট পাঁচেকও যায়নি এমন সময় হঠাৎ কার ধাক্কায় চমকে উঠলাম। পিছনে চেয়ে দেখি কেউ নেই। ভয়ে আমার সকল গা কাঁটা দিয়ে উঠল। কাউকে দেখি না··· অথচ ধাক্কা মারল কে?—ডাক্তার তো একটিও মরেনি, অজ্ঞান হ'য়ে আছে মাত্র। তা ছাড়া মানুষ মরলেই যে ভূত হয় এটা আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। কিন্তু তবু কেমন যেন ভয় হ'তে লাগল। ভয়ে চেঁচাতেও পারছি না, অথচ না চেঁচিয়েই বা কতক্ষণ থাকব? আমার চীৎকার শুনলে

মণ্টু আর নিতাই দুজনেই হয় তো ডাক্তারদের মতোই অজ্ঞান হ'য়ে পড়বে। চীৎকারটা গলা পর্যন্ত এসেছিল, তাকে গলাসুদ্ধ চেপে ধরলাম, তারপর চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, "কে তুমি ধাক্কা মারছ?"

শূন্য জায়গা থেকে উত্তর এল, "আমি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।"

আরও চমকে উঠলাম। আমার সমস্ত গা হাত পা কাঁপতে লাগল, মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না। শুনতে পেলাম "যে বাঘকে গুহার মধ্যে ফেলে এসেছ আমি সেই বাঘ।"

কপালের ঘাম মুছে বললাম, "তা হ'লে তো খুব ভালই হ'ল, কিন্তু তুমি কি ম'রে গিয়ে ভূত হ'য়ে এসেছ?"

বাঘ বলল, "না, আমি তপস্যা ক'রে সিদ্ধিলাভ করেছি তাই ইচ্ছে করলেই এখন অদৃশ্য হ'তে পারি। আর শুধু তাই নয়, আমি এতদিন কিছু না খেয়ে তপস্যা করেছি ব'লে, এখন সব কিছু খেতে পারি। আমি আগে যেমন হিংসা করতাম, এখন আবার সেই রকম হিংসা করতে পারি—তবে ভয় নেই তোমাদের কোনো অনিষ্ট আমি করব না।"

আমি বললাম, "এ আবার কেমন তপস্যা? তপস্যা ক'রে কেবল অদৃশ্য হ'তে পারলে, হিংসা ছাড়তে পারলে না?"

বাঘ আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপে চুপে বলল "খাওয়ার সঙ্গে তপস্যার কোনো সম্পর্ক আছে এমন কথা

আমি আর বিশ্বাস করি না, কিন্তু এ সব কথা এখন আর বলব না, তোমরা ছেলেমানুষ, বুঝতেও পারবে না। তবে এইটুকু শুধু জেনে রাখ যে আমি আবার সংসারে ফিরে যাব এবং আগে যা যা করেছি সে সবই করব।”

আমি জিজ্ঞাসা করললাম, “মানুষও খাবে?”

বাঘ বলল, “তা বলতে পারি না; তার কারণ, যে-মাংস রোজ খাই সেইটেই খেতে ভাল লাগে। মানুষের মাংস তো আর রোজ পাই না, কাজেই খেতে প্রবৃত্তি হয় না, তবে তা যে খারাপ লাগে তা নয়। এক এক দেশের এক এক রকম মানুষ ভাল লাগে।”

জিজ্ঞাসা করলাম, “বাংলাদেশের কোন্ কোন্ মানুষ তোমার ভাল লাগে?”

বাঘ এদিক ওদিক চেয়ে খুব চাপা গলায় বলল, “কাউকে ব'লো না. বাংলাদেশের কবিদের মাংস আমার ভারি পছন্দ।”

“কেন?”

বাঘ বলল, “কেন জানি না, তবে কবি দেখলেই জিভ দিয়ে জল পড়ে।”

আমি বললাম, “তবে যে লোকে বলে বাংলাদেশের কবিদের মাংস নেই।”

বাঘ বলল, “মাংস নেই ব'লেই খেতে খুব আরাম। হাড়গুলো চিবিয়ে চিবিয়ে খাই, তাতে দাঁতের স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে।”

মণ্টু ও নিতাই দূরেই ছিল, সর্দারও একটু দূরে বসে ছিল, তাই আমরা নির্ভয়ে চুপে চুপে আলাপ করতে লাগলাম। বাঘকে বললাম, "দু একটা ডাক্তার খেয়ে দেখ না কেমন লাগে।"

"তা কথাটা মন্দ বলনি। যাদের দেখছি এরা বুঝি সব ডাক্তার? কিন্তু এরা বেঁচে আছে তো—আমরা কিন্তু মরা মানুষ খাইনা।" এই কথা ব'লে বাঘ অজ্ঞান-হওয়া ডাক্তারদের শুঁকে দেখে বলল, "মরেনি তো! তা হ'লে তোমার অনুমতি নিয়ে শুভ কাজ আরম্ভ করি।"

বাঘকে দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু সুমুখেই দেখতে পেলাম একটা ডাক্তারের ঘাড় থেকে খানিকটা মাংস ছিঁড়ে গেল, আর সেইখান থেকে তীরবেগে রক্তের স্রোত বইতে লাগল। কিন্তু এক সেকেণ্ডের বেশি আর দেখতে পারলাম না, আমার গায়ে এক ধাক্কা মেরে বাঘ বলতে লাগল, "আরে রামো-রামো —এর চোদ্দ পুরুষে কেউ ডাক্তার নয়! সব ভণ্ড, প্রতারক! কম ক'রেও চার পাঁচটা ডাক্তার আমি এর আগে খেয়েছি, কিন্তু তারা তো এর মতো এমন অখাদ্য নয়!—নিশ্চয় এরা সব জোচ্চোর—লোক ঠকিয়ে খায়।"

মনে হ'ল বাঘ ঠিক কথাই বলছে। সর্দারও বলেছিল এদেশে ডাক্তারি শিখতে কাউকে কিছু পড়াশোনা করতে হয় না, ডাক্তারি করতে কাউকে কিছু শিখতে হয় না। বাঘকে সে কথা জানালাম। বাঘ বলল, "এদের সবাইকে মেরে রেখে গেলে মন্দ হয় না।"

আমি বললাম, "না ভাই বাঘ, ও রকম কিছু ক'রো না, তা হ'লে আমাদের ভারি নিন্দা হবে, বিদেশে এসে নিন্দার কিছু করা উচিত নয়। তার চেয়ে চল আমাদের সঙ্গে, তুমি অদৃশ্য হ'য়েই থেকো, তা হ'লে বেশ মজা হবে।"

আমরা সবাই আবার চলতে লাগলাম। বাঘ অদৃশ্য হ'য়েই রইল। মণ্টু বলল, তার ডায়েরির নতুন লেখাগুলো খুব নাকি মনের মতো হয়েছে। নিতাই এক ডাক্তারের হাত থেকে প্রকাণ্ড এক থার্মোমিটার নিয়ে এসেছে, সে জন্য তারও খুব ফূর্তি হয়েছে। কিন্তু সর্দার সেটা দেখে বলল, সেটা থার্মোমিটার নয়, গোরু-তাড়ানো ছোট লাঠি!

অষ্টম অধ্যায়

নাটক দেখা

কিছুদূরে এগিয়ে যেতেই দেখি প্রকাণ্ড এক হলঘরে এই নতুন দেশের নাটক অভিনয় হচ্ছে। সর্দার জিজ্ঞাসা করল, "দেখবে আমাদের নাটক ?"

আমি বললাম, "সকাল বেলাতেই নাটক ?"—

সর্দার বলল, "শুধু সকাল বেলা নয়, চব্বিশ ঘণ্টা ধ'রেই আমাদের নাটক অভিনয় হয়।"

আমি বললাম, "নিশ্চয় দেখব তোমাদের নাটক, নাটক দেখতে আমরা বড় ভালবাসি। আমাদের স্কুলে আমরা নাটক অভিনয় করি, তোমাদের নাটক দেখলে নিশ্চয় নতুন অনেক কিছু শিখতে পারব। কিন্তু সর্দারজি, টিকিট কেনার মতো পয়সা হয় তো আমাদের কাছে নেই।"

সর্দার বলল, "আমাদের দেশের নাটক দেখতে পয়সা লাগে না। এখানে লোক জোটানোই এক দায়। অথচ এমন সুন্দর আমাদের নাটক, আর এমন বাস্তব যে তোমরা দেখতে বসলে ভুলেই যাবে যে নাটক দেখছ ; তোমাদের মনে হবে সত্যি ঘটনা দেখছ।"

সর্দারের কথা শুনে ভয়ানক কৌতূহল হ'ল। আমরা কয়েকটা খালি আসনে গিয়ে বসলাম। নাটক আরম্ভ হ'তে

আর কয়েক মিনিট মাত্র বাকী, শুনলাম এখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা থেকে সকাল সব সময়েই নাটক অভিনয় হচ্ছে। এখানে একই পালা দশবারো বার অভিনয় হয়। এখন অভিনয় হচ্ছে রাবণবধ। এই নতুন দেশের লোকেও রাবণের কথা জানে দেখে খুব ভাল লাগল।

দর্শকদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর এক কোণে একটি লোককে দেখে আমরা হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলাম। দেখলাম লোকটা ব'সে আছে বটে কিন্তু তার মাথা নেই।

সর্দার আমাদের বিস্ময় দেখে বুঝতে পেরে বলল, "ওকে দেখে ভয় পেয়ো না, ঐ হচ্ছে নাট্যকার। রাবণবধ পালা ওরই লেখা।"

"তা হ'লে ওর মাথা নেই কেন?"—মণ্টু প্রশ্ন করল।

সর্দার বলল, "আমাদের দেশের নাটক লেখকদের মাথা থাকতে নেই। তুমি হয়তো লক্ষ্য করনি, আমাদের দেশে কতকগুলো লোকের মাথা নেই, শুধু হাত পা আর দেহটা আছে। তারা সবাই নাটক লেখে। কিন্তু এতে সুবিধা হয় কি জান? সুবিধা হয় এই যে এরা তাড়াতাড়ি অনেক নাটক লিখে ফেলতে পারে, দরকার হ'লে প্রতিদিন একখানা ক'রেও লেখে।

নিতাই এতক্ষণে কথা বলল। তাকে আমরা এতক্ষণ বিশেষ লক্ষ্যই করিনি। সে বিরক্ত হ'য়ে বলল, "তোমরা একটু চুপ কর, নাটক যে আরম্ভ হ'য়ে গেল দেখছ না?"

নাটক সত্যই আরম্ভ হ'ল। আগেই বলেছি নাটকের নাম রাবণবধ, দুইপাশে রাম এবং রাবণের সৈন্যেরা এসে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে রাবণ প্রবেশ ক'রে একপাশে কখন দাঁড়িয়েছে টের পাইনি—কিন্তু দর্শকদের সবাই একসঙ্গে 'ঐ রাবণ ঐ রাবণ' ক'রে হেসে ওঠাতে বোঝা গেল রাবণ এসেছে। রাবণ তার সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে আদেশ দিল—"মারো বানর সৈন্যদের, মেরে একেবারে শেষ ক'রে দাও।"

এ কথায় উপরের কোনো অদৃশ্য জায়গা থেকে হনুমান এক লাফে স্টেজের উপর প'ড়ে রাবণের দিকে চেয়ে ভেংচি কাটতে লাগল, আর বলতে লাগল, "তবে রে হতভাগা রাবণ, তোর দম্ভ আজ আমি চূর্ণ করব। াবণ বলল, "সে আর তোর কাজ নয় পাষণ্ড হনুমান। আমি অমর, আমাকে কেউ মারতে পারে না।" হনুমান বলল, "সে আমি খুব জানি। তোর মৃত্যুবাণ কোথায় আছে তাও জানি।—আর এই দেখ তা নিয়েও এসেছি। এই বাণ রামের হাতে পড়লে তোর আর রক্ষা নেই।'

রাবণ হেসে বলল, "ও সব ধাপ্পাবাজিতে আমি ভুলছি না, আমার মৃত্যুবাণ এমন এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি যে তোর মতো মূর্খ তার সন্ধান পাবে না। যেটা দেখাচ্ছিস ওটা নকল বাণ, তুই কোত্থেকে তৈরি করিয়ে এনেছিস, ওতে রাবণ ভয় পায় না।"

হনুমান বলল, "ভয় পাও কি না টের পাওয়াচ্ছি। ঐখানে

চুপ করে দাঁড়াও। প্রভু রামচন্দ্র, এই নিন রাবণের মৃত্যুবাণ, মারুন ওর বুকে।”

রামচন্দ্র একটি কথা না ব'লে হনুমানের হাত থেকে বাণটি ধনুকে লাগিয়ে এমন জোরে রাবণের বুকে ছুঁড়ে মারল যে রাবণ তার ধাক্কা সামলাতে না পেরে চীৎকার ক'রে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষস সৈন্যরা করুণ সুরের একটা গান ধ'রে দিল এবং গান শেষ হওয়ামাত্র বানর সৈন্যরা 'রামচন্দ্রের জয়' ধ্বনিতে চারিদিক কাঁপিয়ে রাক্ষস সৈন্যদের ঠাট্টা করতে করতে চলে গেল।

অভিনয় শেষ হ'য়ে গেলে সর্দার আমাকে জিজ্ঞাসা করল, “কেমন লাগল?”

আমি বললাম, “কৈ সব সত্যিই ঘটছে এমন তো মনে হ'ল না।”

সর্দার বলল, “কেন, রাবণের মৃত্যু?”

“ও কি সত্যিই মরেছে?”

সর্দার অবাক হ'য়ে বলল, “তা হ'লে এতক্ষণ দেখলে কি?”

নবম অধ্যায়

খিলঙের হাসি

সর্দার বলতে লাগল, "এটাই আমাদের নাটকের নিয়ম। নাটকে যার মৃত্যুর কথা থাকবে স্টেজে তাকে মরতেই হবে। চল শ্মশানঘাটে গিয়ে দেখবে চল। সেখানে গেলে দেখতে পাবে কত লোক এসেছে রাবণের চিতা দেখতে।" গেলাম শ্মশানঘাটে। গিয়ে দেখলাম সর্দারের কথা মিথ্যা নয়—বহু লোক এসেছে সেখানে।

অদৃশ্য বাঘ আমাদের সঙ্গেই ছিল, সে আমাকে চুপে চুপে বলল, "মরা মানুষের গন্ধ আমার একটুও সহ্য হয় না, চল এখান থেকে পালাই, শ্মশানের ভীড় দেখে লাভ কি ?

আমি বললাম, "আরও একটু থাক, সর্দার নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে আমাদের এখানে ডেকে এনেছে, তার সময় হ'লেই এখান থেকে চলে যাব।"

বাঘ বলল, "তা হ'লে তোমর বস, আমি একটু ঘুরে আসি।"

"কোথায় যাবে এখন আমাদের ফেলে ?"

"বেশি দূরে নয়, বড় ক্ষিদে হয়েছে একটু জলযোগ করে আসি।"

"কোথায় ?"

"যে লোকটার মাথা নেই মনে আছে? সেই লোকটাকে দেখে তখন আমার বড় লোভ হয়েছিল, তাকে খেয়ে আসি।"

"বল কি, নাট্যকারকে খাবে?"

"খেলে বোধ হয় এদেশের উপকারই করা হবে, তুমি আর আমাকে বাধা দিও না, আমি মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ঘুরে আসছি।"

বাঘকে আর ঠেকানো গেল না, সে নাট্যকারকে খেতে চলে গেল।

সর্দার বলল, "তোমাদের শ্মশানে এনেছি আমাদের নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করতে। শোন, আমাদের রাজার বিচারে এখানে যাদের মৃত্যুদণ্ড হয়, তাদেরই এখানে এনে নাটকের প্যাঁচে ফেলে মারা হয়। এতে যে লোকটি মরে, সে মরার আগে দর্শকদের আনন্দ দিয়ে যায়। রাজার কাছে যে লোকটি হয় অভিযোগকারী, স্টেজে সেই হয় হত্যাকারী।"

সর্দার এইটুকু মাত্র বলেছে এমন সময় একটা লোক ভীড়ের ভিতর থেকে হঠাৎ হো হো হো হো করে হাসতে হাসতে ছুটে বেরিয়ে গেল! কি সাংঘাতিক তার হাসির শব্দ, ভীড়ের সকল কোলাহল ছাপিয়ে উঠল সেই হাসি। সেই লোকটি যেন হাসির অনেকগুলো পটকা ফাটিয়ে চলে গেল। ভীড়ের মধ্যেকার সবাই সেই সঙ্গে হাসতে লাগল।

মণ্টু আর নিতাইও তা দেখে খুব এক চোট হেসে সর্দারকে প্রশ্ন করল, "লোকটা কে বল তো সর্দার?"

সর্দার বলল, "সে এক কাহিনী, আমার কাছে এসে ব'স, বলছি।"

আমরা সর্দারের কাছে এগিয়ে গেলাম, সর্দার বলতে লাগল, "ঐ লোকটির নাম খিলং, কিন্তু খিলংএর গল্প বলতে হ'লে পং নামক একটি লোকের কথা আগে জানা দরকার। পং আমাদের শহরেরই লোক, বড়ই কৌতুকপ্রিয়। সে নানারকম গল্প ব'লে আসর জমাতে পারে। অনেকে তার গল্প শুনে খুব মজাও অনুভব করে। যে লোকটি আজ রাবণ সেজে স্টেজের উপর মারা গেল এবং যার চিতা দেখতে আমরা এসেছি, সে ঐ পং। আগেই অবাক হয়ো না, সবটা শোন। পং কি অপরাধে শাস্তি পেল, সব শুনলে বুঝতে পারবে। খিলংএর হাসির শব্দ শুনেছ। খিলং এক অদ্ভুত লোক। কোনো কারণে যদি সে কৌতুক অনুভব করে তা হ'লে তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। সে এমন হাসতে থাকে যে তাকে তখন ছ'সাত জন লোকে চেপে না ধরলে কাছের লোকের বড়ই বিপদ। হাসির সময় সে পাশের লোককে কামড়াতে থাকে।

"একদিন এই খিলং আমাদের রাবণ বধ পালা দেখতে এসেছিল। হঠাৎ এক সময় হনুমানের লেজ দেখে সে আর হাসি থামাতে পারে না। চীৎকার ক'রে, হো হো হি হি ক'রে, সমস্ত থিয়েটার ঘরে এক তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুলল। যত তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় হাস কেন, ততই সে ক্ষেপে যায় আর মাঝে মাঝে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, হা হা হনুমানের

লেজ, হো হো হনুমানের লেজ, হি হি হনুমানের লেজ। তা দেখে স্টেজের উপর হনুমান (সেও মানুষ তো !) হাসতে আরম্ভ করল। শেষে রাবণ, রাম এবং যত রাক্ষস আর বানর সৈন্য ছিল তারা সবাই মিলে হাসতে আরম্ভ করল। রাম রাবণকে মারতে ভুলে গেল, রাবণ বানর সৈন্যদের গাল দিতে ভুলে গেল, রাম রাবণের গলা জড়িয়ে ধ'রে হাসতে লাগল। থিয়েটারের ম্যানেজার তাদের থামাতে গিয়ে থামাতে পারল না, উল্টে সে নিজেই হাসতে আরম্ভ করল। হনুমান হাসতে হাসতে ম্যানেজারের ঘাড়ের উপর প'ড়ে তাকে চিৎ ক'রে ফেলল। ম্যানেজার এক বানর সৈন্যের লেজ ধ'রে মাটিতে গড়াতে লাগল। দর্শকদের কথা আর না বলাই ভাল। তারা ততক্ষণ চেয়ার ভেঙে, থিয়েটার ঘরের দরজা জানালা ভেঙে হাসতে হাসতে চীৎকার করতে আরম্ভ করছে। ম্যানেজার যতই সবাইকে শাসন করতে যায়, ততই তার হাসির তেজ বাড়তে থাকে। রাবণকে শাসন করতে গিয়ে দেখে রাবণ রামকে জড়িয়ে ধ'রে মাটিতে গড়াচ্ছে, রাবণ রামের পেটে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, রামও রাবণকে ছাড়ছে না। ম্যানেজার অনেক চেষ্টা ক'রে গম্ভীর হয়েছিল কিন্তু এই দৃশ্য দেখে সে আবার হাসতে লাগল। চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়েও নিস্তার নেই, যেদিকে তাকায় সেই দিকেই হো হো হি হি।

"স্টেজের উপর যে লোকটি হাসি থামিয়ে মাটি থেকে

উঠে দাঁড়াবে মনে করছে, হনুমান তারই পায়ে লেজ জড়িয়ে চিং করে ফেলছে, সে সময় কারোই কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। হনুমান মাসে মাত্র দশটি টাকা মাইনে পায়, অন্য সময় ম্যানেজারকে দেখে ভয়ে কাঁপে, কিন্তু সেদিন ম্যানেজারের গায়ে লেজ জড়িয়ে চিং ক'রে ফেলতে তার কোনো সঙ্কোচই নেই!

"এইভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটার পর সবাই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল, কারো আর কথা কইবার সামর্থ্য রইল না। কিন্তু তবু রাম, রাবণ, হনুমান প্রভৃতি মিলে অভিনয়ের জন্য একবার শেষ চেষ্টা করতে গেল, কিন্তু স্টেজের উপর কেউ আর দাঁড়াতে পারল না। রাবণ ছিল খুব শক্ত লোক, সে অনেক কষ্টে রামের কাছে এগিয়ে গিয়ে বুক খুলে দিয়ে বলল, রাম, আর যুদ্ধ করতে হবে না, তুমি যা যা করবে তা আমার জানা আছে, শেষ অবধি আমাকে মারবে তো? তা নাও, এই বুক পেতে দিচ্ছি, এখনই মার, মুখস্থ করা পার্ট আজ আর বলতে পারব না. তুমি কোনো কথা না ব'লে সোজা তোমার তীর আমার বুকে বিঁধিয়ে দাও।

"রাম তখন অত্যন্ত ক্লান্ত, তার কথা বলার ক্ষমতাই নেই, সে বলল, ভাই রাবণ, তোমাকে আজকের মতো ক্ষমা করলাম। তুমি যে সুড়সুড়ি আমার পেটে দিয়েছ তা মনে করলে এখনও হাসি পাচ্ছে। রাবণ বলল, ভাই রাম, তুমিই কি আমাকে ছেড়ে কথা বলেছ? আমি মোটা মানুষ,

তাতে কি কষ্ট যে পেয়েছি তা আর কি বলব! কিন্তু কে ঐ লোকটা যে আমাদের এমন ক'রে হাসিয়েছে?

"রাম বলল, ওকে আগে কখনো দেখিনি, এখন একবার ভাল ক'রে দেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শুনেছি পালিয়ে গেছে। হনুমানের লেজ দেখে যে কারো এত হাসি পেতে পারে তা আমি ধারণাই করতে পারিনি, আজকের কথাটা আমি কোনো দিন ভুলব না।

"রাম আর রাবণ এই সব আলোচনা করছিল এমন সময় ম্যানেজার সেখানে এসে বলল, আজ আর অভিনয় করতে হবে না, তোমরা এখন বাড়ি যাও, আমি রাজার কাছ থেকে রাবণের প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে নেব, তাকে বোধ হয় এবারে আর মরতে হবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি আবার কোনো অপরাধ করে তা হ'লে কিন্তু তখন আর ক্ষমা করা হবে না। লোকটা নিশ্চয়ই খিলং। ওকে পেলে ভবিষ্যতে ওকেই রাবণ সাজানো হবে। রাম একথা শুনে বলল, না ম্যানেজার মশাই, এমন কাজ কখনো করবেন না, সে রাবণ সাজলে আরও মুস্কিল হবে। হনুমানের লেজ দেখে যে লোকটা এত হাসতে পারে, হনুমানের লেজ ছুঁলে যে সে কি করতে পারে তা ভাবলেও ভয় হয়। তা হ'লে রাম আর তাকে মারতে পারবে না, সেই হয়তো রামকে মেরে ফেলবে। ম্যানেজার ভেবে দেখল কথাটা ঠিক।

"কথাটা রাজার কানে গেল। রাজা তাকে ধরিয়ে

আনলেন। লোকটা খিলং ছাড়া আর কেউ নয়। খিলং রাজার সামনে একবার হাসার উপক্রম করেছিল, কিন্তু তাঁর অস্ত্রের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে যায়।

"রাজা প্রশ্ন করলেন, তুমি লেজ দেখে হেসেছ কেন? খিলং তার উত্তরে প্রকাশ করল, হনুমানের লেজ দেখে তার হাসি পায়নি, আর লেজ দেখে যে হাসি পেতে পারে সে রকম কল্পনাও তার হয়নি। তার পাশে পং নামক একটি লোক বসে ছিল সেই নাকি লেজের একটা অসঙ্গতি প্রথম লক্ষ্য করে। হনুমানের লেজ মেরুদণ্ডের ঠিক শেষ প্রান্ত থেকে না বেরিয়ে পাঁচ ছ' ইঞ্চি বাম দিকে স'রে ভুল জায়গা থেকে বেরিয়েছিল। পং সেইটে দেখিয়ে দেওয়াতে তার হঠাৎ হাসি পায় এবং তারই ফলে এই কাণ্ড। সাক্ষী ডাকা হ'ল, সবাই সেটা সমর্থন করল। তখন রাজা মনে মনে দুজনকে অপরাধী সাব্যস্ত করলেনঃ পং এবং থিয়েটারের ড্রেসারকে। বিচারে শেষ পর্যন্ত ঠিক হ'ল ড্রেসার নিরপরাধ, পংই অপরাধী। তাই তাকে আজ রাবণ সাজতে হয়েছে এবং তার ফলে মরতে হয়েছে।"

সর্দারের মুখে এই কাহিনী শুনে আমরা তো অবাক! ভারি ইচ্ছে হ'ল খিলংকে দেখতে।

আমার পাশেই কখন রয়্যাল বেঙ্গল অদৃশ্য ভাবে এসে দাঁড়িয়েছে তা এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি। সে চাপা গলায় আমাকে বলল, "নাট্যকারকে শেষ করেছি, মন্দ লাগল না

খেতে, এখন মন অনেকটা খুশী আছে—চল এবারে তোমাদের সঙ্গেই খানিকটা বেড়ানো যাক।”

বাঘের এই কথা শুনে খুব নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কখন কি বিপদ হয়, হ'লে আমরা তিনজনে হয়তো ভয়েই অজ্ঞান হ'য়ে পড়ব। কিন্তু বাঘ সঙ্গে থাকতে আর আমাদের ভয় নেই।

আমার অনুমান যে মিথ্যা নয়, পরের ঘটনা থেকেই তা বেশ বোঝা গেল।

দশম অধ্যায়

দাঙ্গাকারী চিৎপটাং

রাবণের চিতার কাছ থেকে আমরা রওনা হলাম রাজ-বাড়ির দিকে। যেতে যেতে দেখি রাস্তার লোকেরা খুব ব্যস্ত হ'য়ে ছুটে চলেছে ; আর তারা এমন ভাবে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে যেন আমরা তাদের শত্রু। আমরা বিদেশী লোক, কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি তা তারা কেউ জানে না, যদি তাদের কোন অনিষ্ট করি এই তাদের ভয়।

একদল লোক দেখলাম, চেহারা তাদের ভয়ানক বিশ্রী, গায়েও তাদের ভীষণ শক্তি, আমাদের দেখে তারা গোপনে কি যেন পরামর্শ করতে লাগল, তারপর খুব জোরে ছুটে পালিয়ে গেল। চার দিকেই যেন কেমন একটা ভাব। এ সব দেখে সর্দারের মুখেও যেন কেমন একটা ভয় ফুটে উঠল। আমাদেরও ভয় হ'ল তা দেখে!

সর্দার বলল, "এরা কোনো আইন মানে না, ভয়ানক এদের হিংস্র স্বভাব, আমাদেরও বড় একটা মানে না। শহরে এরা খুব কমই আসে, তাই আজ এদের দেখে খুব সন্দেহ হচ্ছে, হয় তো এরা কিছু গোলমাল বাধাতে পারে। হয়তো জানতে পেরেছে শহরে বিদেশী লোক এসেছে তাই শহরে এসে এরা

তোমাদের দেখে গেল।—কিন্তু শেষকালে তোমাদের কোনো অনিষ্ট ক'রে না বসে।"

নিতাই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞাসা করল, "আমরা এখন কি করব?"

সর্দার বলল, "ওরা যদি আক্রমণ করে তা হ'লে তোমাদেরও পাল্টা আক্রমণ করতে হবে, না হ'লে ওরা তোমাদের মেরে ফেলতে পারে। আর যদি সাহস না পাও তা হ'লে এখুনি এ দেশ থেকে পালিয়ে যাও।"

নিতাই এ কথার উত্তরে কিছু না ব'লে আমার দিকে চাইল। আমি কি করব তাই ভাবছিলাম। সত্যিই ওরা যদি দল বেঁধে আমাদের মারতে আসে তা হ'লে আমরা তিনটি বালক তাদের রোধ করব কি ক'রে? কিন্তু পালিয়ে যাওয়া যে আরও লজ্জাকর। বড় সমস্যায় পড়া গেল! এমন সময় বাঘ আমাকে চুপে চুপে বলল তার মাথায় একটা মতলব এসেছে। বাঘ বলতে লাগল, "ওরা যদি আক্রমণ করে তবে আমি একাই তোমাদের বাঁচিয়ে দিতে পারব। অবশ্য ওদের প্রত্যেককে আমি মেরে ফেলতে পারি, কিন্তু আগেই তা করব না, আমি ওদের নিয়ে খুব একটা মজা করব। তুমি সর্দারকে বল, তোমরা পালাবে না, ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, ইতিমধ্যে আমি তোমাদের কাছ থেকে একটুক্ষণের জন্য দূরে যাচ্ছি, ভয় নেই, খুব শীগগিরই ফিরে আসব।"—এই বলে বাঘ চলে গেল।

আমি বাঘের কথায় আশ্বস্ত হ'য়ে সর্দারকে বললাম, "আমরা পালাব না, যুদ্ধই করব, তারা আসুক।"

নিতাই এ কথা শুনে গলা দিয়ে অদ্ভুত এক আওয়াজ বা'র করল, তা শুনে চমকে উঠে তার দিকে চেয়ে দেখি নিতাই কাঁপতে কাঁপতে ছোট হ'য়ে যাচ্ছে। বেশি ভয় পেলে সে এই রকম ছোট হ'য়ে যায়, কিন্তু সে যে এত ছোট হ'য়ে যেতে পাবে তা কল্পনাই করতে পারিনি।—হ'ল ঠিক একটি মার্বেলের মতো। তার এই ছোট হওয়াব অবস্থা দেখে হাসিও পেল, দুঃখও হ'ল। কি আর করা যায়, তাকে ও রকম অবস্থায় বাইরে রাখা যায় না, হয় তো কখন পায়ের নীচে পড়ে চ্যাপ্টা হ'য়ে যাবে! তাই তাকে তুলে মণ্টুর পকেটের মধ্যে রেখে দিলাম। পকেটে ব'সে সে কাপতে লাগল।

সর্দারের কথাই ঠিক। আমরা দেখতে পেলাম সেই ভীষণ লোকগুলো বড় বড় লাঠি নিয়ে আমাদেব দিকে ছুটে আসছে। ঝড়ের আকাশের এক প্রান্তে কালো মেঘের একটুখানি আভাস দেখা যায়, তারপর মুহূর্তের মধ্যে সেই কালো মেঘ সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলে। এই কালো দৈত্যের মতো লোকগুলোও তেমনি ক'রে মাঠের এক প্রান্ত থেকে আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল এবং ছুটে এসে মাঠ ছেয়ে ফেলল। সংখ্যায় তারা অনেক, প্রায় একশো হবে! সর্দার নিজেই তাদের দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল, ব'লে গেল, "আমি রাজার কাছে যাচ্ছি খবরটা দিতে, দেখি যদি কিছু করতে পারি।"

মণ্টু ইতিমধ্যে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সে এখনও বাঘের কথা কিছুই জানে না, তবু সে যে ছেলে-মানুষ হ'য়েও এতগুলো অসভ্য লোকের সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত, এতে তার প্রতি আমার খুব শ্রদ্ধা হল। জিজ্ঞাসা করলাম, "পারবে লড়তে ওদের সঙ্গে ?"

মণ্টু বলল, "পারব কিনা জানি না, কিন্তু লড়াই করতেই হবে, এতে যদি মরি সেও ভাল।"

মণ্টুর সাহস দেখে আমি সত্যিই চমকে গেলাম। মনে খুব আনন্দও হ'ল। বললাম, "ঠিক কথা, আমরা যুদ্ধই করব, পালাব না।"

চেয়ে দেখলাম শত্রুর দল অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। মণ্টু বলল, "আমার পকেটটা ভিজে উঠছে কেন ?"

পকেট ভিজে উঠছে! মণ্টু বলে কি? পকেট ভিজবে কেন? চেয়ে দেখি সত্যিই মণ্টুর পকেট ভিজে উঠেছে এবং তা দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ছে। কাছে গিয়ে পকেট পরীক্ষা ক'রে দেখলাম পকেটের মধ্যে নিতাই চিঁ চিঁ করে কাঁদছে আর তার চোখের জলে পকেটের এই দুর্দশা। পকেট থেকে নিতাইকে বের করে দিলাম। তাকে কোথায় রাখি সে এক সমস্যা—এ দিকে সময়ও বেশি নেই।

শত্রুদল ভয়ানক চীৎকার করতে করতে এগিয়ে আসছে।

তাদের গোলমাল শুনে শহরের লোক ছুটে এল মজা

দেখতে। আমরা যেখানে ছিলাম সেটা একটা মাঠের মতো। সেই মাঠের চারদিকে সবাই এসে ভীড় করল।

আমাদের শত্রুরা তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে আসছে।

নিতাইকে অগত্যা আমার মানিব্যাগের মধ্যে রাখলাম—সে ভয়ে আরও ছোট হ'য়ে একটা মুক্তোর মতো হয়ে গেছে!

শত্রুপক্ষ আরও এগিয়ে আমাদের কাছ থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে গর্জন করতে লাগল। তাদের দলপতির হাতে এক প্রকাণ্ড লাঠি। সে এই লাঠি তার মাথার উপর বন্‌বন্‌ ক'রে ঘোরাতে লাগল, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে মারবে এই তার মতলব। আমি মণ্টুকে বললাম, "লাঠির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, লাঠি ছুঁড়লেই মাটিতে শুয়ে পড়বে, তা হ'লে হয়তো লাঠির হাত থেকে বেঁচে যাব।"

বলতে বলতেই লাঠি তীর বেগে ছুটে এল আমাদের দিকে। আমরা সেজন্য প্রস্তুতই ছিলাম, নইলে কাউকে আর বাঁচতে হ'ত না। আমরা শুয়ে পড়াতে লাঠি আমাদের পিছনে এসে পড়ল। উঃ সে কি ভীষণ শব্দ! শুনেই আমাদের মাথা ঘুরে গেল।

কিন্তু কোন্‌ সাহসে আমরা এতগুলো দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছি? আমাদের না আছে অস্ত্র, না আছে লড়াইয়ের যোগ্যতা! দুখানি হাত আমাদের সম্বল! কিন্তু এ ছাড়া আরও একটি জিনিষ আছে, সে হচ্ছে আমাদের মনের জোর আর সাহস। আমাদের এই সাহস দেখেই তো ওরা সোজাসুজি

আমাদের কাছে আসতে পারছে না, পঞ্চাশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে।

আমাদের অবশ্য আর একটা ভরসা আছে। বাঘ আমাদের বলেছে, সে এমন একটা কাণ্ড করবে যাতে আমাদের ওরা কোন অনিষ্টই করতে পারবে না। কিন্তু কোথায় বাঘ?

এ দিকে শত্রুপক্ষ আমাদের মারতে না পেরে আরও উত্তেজিত হ'য়ে উঠল। তাদের দলপতি আশা ভঙ্গের দরুন চটে গিয়ে লাফাতে আরম্ভ করল এবং আরও বেশি গর্জন করতে লাগল। তার পাশেই যে লোকটা ছিল সে তার লাঠিখানা দিল দলপতির হাতে।

লাঠি পেয়ে দলপতি আবার চাঙ্গা হ'য়ে উঠল। সে আবার মাথার উপর লাঠি ঘোরাতে লাগল। ঘোরাতে ঘোরাতে যেমন সে লাঠিখানা আমাদের দিকে ছুঁড়বে এমন সময় এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল।

দলপতি কোনো অজ্ঞাত কারণে লাঠিসুদ্ধ চিৎপটাং! যেন একটা পাহাড় ভেঙে পড়ল।

"কি হ'ল, কি হ'ল" ব'লে সবাই ছুটে গেল দলপতির কাছে। এমন সুস্থ জোয়ান লোকটি হঠাৎ চিৎপটাং হ'ল কেন?

দেখা গেল দলপতি তার পেট হাতে চেপে ধ'রে "ওরে বাপ্ রে মা রে, কি হ'ল রে" ব'লে ভীষণ চীৎকার করছে। চীৎকার শুনে সবাই মিলে তার পেট টিপে দিতে লাগল—

কিছুক্ষণের মধ্যেই দলপতি একটু সুস্থ বোধ করল। সুস্থ হ'য়েই উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু উঠে দাঁড়াতেই তার মনে আবার হিংসা জেগে উঠল। চোখ দুটো তার আগুনের মতো জ্বলতে লাগল, এবারে সত্যিই আর আমাদের নিস্তার নেই।

কিন্তু এবারেও দলপতির আশা পূর্ণ হ'ল না; সে লাঠিখানা তুলে ধ'রে দাঁতে দাঁত চেপে আমাদের দিকে ছুঁড়বে ব'লে প্রস্তুত হয়েছে এমন সময় আবার চীৎকার এবং আবার চিৎপটাং।

আগের মতো সবাই এল তার শুশ্রূষা করতে। কিন্তু দুবার পড়ে যাওয়াতে সে এমন ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে যে আর তার যুদ্ধ করার প্রবৃত্তি নেই। সে আর সবাইকে আদেশ দিল আমাদের আক্রমণ করতে। আদেশ পাওয়া মাত্র তারা একে একে এগিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত হ'ল। কিন্তু একে একে প্রত্যেকেই তারা দলপতির মতো পেটে হাত দিয়ে চীৎকার করতে করতে পড়ে যেতে লাগল। এই ভাবে যখন অন্তত পনেরো জন লোক পড়ে গেল, তখন সবার খেয়াল হ'ল, এর মানে কি? প্রত্যেকের মুখে ঐ একই কথা, "এর মানে কি?"—মানে না বুঝে সবাই ক্রমে ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। জীবনে তাদের এমন বিপদ কখনও হয়নি।

দর্শকের মধ্যেকার কেউ কেউ আমাদের দেখিয়ে বলতে

লাগল, এই নতুন মানুষের ছেলেরা আসলে মানুষ নয়, ওরা নিশ্চয়ই দেবতা বা আর কিছু হবে।” অন্য লোকেরা বলল, “দেবতা-টেবতা নয়, সাধারণ মানুষ, তবে হয় তো কিছু মন্ত্র-তন্ত্র জানে—এই একটা ব্যাপার দেখেই ফস্ ক’রে কিছু বলা ঠিক নয়।”

ওরা নিজেরা কিছুই ঠিক করতে পারল না, ধাঁধায় পড়ে গেল। কয়েকটা লোক ছুটে চলল রাজাকে ডেকে আনতে। সর্দার অনেক আগেই রাজার কাছে গেছে তা বলেছি।

আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছি। সত্য কথা বলতে কি, ওদের যে কি হ’ল তা আমরাও বুঝতে পারছি না। কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি আমাদের এত বড় বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে! কে সে? মনে হ’ল বাঘ, কিন্তু ঠিক না জানতে পেরে মনে সন্দেহ রয়ে গেল।

দর্শকদের মধ্যে এই সময় হঠাৎ একটা আনন্দ কোলাহল জেগে উঠল। তাকিয়ে দেখি ওদের রাজা এসে পড়েছে। তাকে এই প্রথম দেখলাম। বুড়ো রাজা। মুখের চামড়া দুধারে ঝুলে পড়েছে, চোখ দুটো গর্তের মধ্যে এত ঢুকে আছে যে দেখাই যায় না। ঠোঁট দুটো অত্যন্ত পুরু, নাক মুখ লম্বা এবং মোটা, অন্য পাহাড়ী লোকদের সঙ্গে মেলে না। রাজা খুব খাটো, খুব মোটা, মাথাটা একটা কুমড়োর মতো। পোষাক নানা রঙের। রাজার সঙ্গে কয়েকজন দেহরক্ষী, তাদের প্রত্যেকের হাতে বল্লম আর ঢাল। রাজার মুখ

অত্যন্ত গম্ভীর, দেখলে মনে হয় যেন বড় দুঃখী। মুখের দুধারে যে চামড়া ঝুলছে, মনে হচ্ছে যেন তার মধ্যে ওর সকল দুঃখ পোরা আছে। রাজা কোনো দিন হেসেছে কি না সন্দেহ হয়, যেন সময় পেলেই বসে বসে কাঁদে। রাজার সঙ্গে আমাদের সেই সর্দারও রয়েছে, তার মুখও গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

রাজা এসেছে, কাজেই তার সঙ্গে সিংহাসনও এসেছে। রাজা সিংহাসনে বসেই পকেট থেকে বাদামভাজা বা'র ক'রে খেতে লাগল এবং আমাদের দিকে চাইতে লাগল। রাজার পাশে দাঁড়িয়েছিল রাজার মন্ত্রী, তারও পাশে দাঁড়িয়ে সর্দার। রাজা আমাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে মন্ত্রীকে আদেশ দিল, "ওদের এদিকে ডেকে আন।"

রাজার গলার কি জোর! অতটুকু মানুষ, কিন্তু মনে হ'ল যেন একটি সিংহ গর্জন করছে। রাজার আদেশে মন্ত্রী দেহরক্ষীদের আদেশ দিল আমাদের ধ'রে নিয়ে যেতে। দেহরক্ষীরা এগিয়ে আসতে লাগল।

চকিতে দেখতে পেলাম একটু দূরে একটা লোককে তিন-চার জন লোক হাত-পা ধ'রে ঠেকিয়ে রেখেছে, আর দুজন লোক তার মুখ চেপে ধ'রে আছে। লোকটা যে কে, দূর থেকে বোঝা গেল না, কিন্তু একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি চলছে বেশ বোঝা গেল।

একাদশ অধ্যায়

পেট ও পিঠ

দূরের ঐ লোকটির দিকে আর দৃষ্টি রাখা গেল না, রাজার দুজন দেহরক্ষী আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কিন্তু তারা দুএক পা আসতেই পূর্বের আহত দলপতি চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "ওগো তোমরা ওদের দিকে এগিয়ে যেয়ো না, তোমরা কিছুতেই ওদের ধরতে পারবে না।"

কিন্তু তারা এ কথায় কান দিল না, কেননা রাজার আদেশ তাদের পালন করতেই হবে।

আহত দলপতি বলল, "কি আর করব, আমার কথা যখন শুনলে না, তখন আর আমার কিছু বলবার নেই, যাও আদেশ পালন কর।"

দেহরক্ষীরা তালে তালে পা ফেলে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল, আর বোধ করি হাত-পনেরো এলেই আমাদের ধরে ফেলবে। দর্শকেরাও ইতিমধ্যে আনন্দে খুব চেঁচাতে শুরু করেছে আর সেই সঙ্গে আমরাও অনিশ্চিত ভয়ে হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়ছি। কিন্তু কি আশ্চর্য, সমস্ত জনতাকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত ক'রে একজন দেহরক্ষী আগের ঐ দলপতির মতোই চিৎ হ'য়ে প'ড়ে পেটে হাত দিয়ে আর্তনাদ করতে লাগল। তারপর দ্বিতীয় দেহরক্ষীরও সেই দশা ঘটল কয়েক

সেকেণ্ডের মধ্যেই। তখন রাজা নিজে উঠল সিংহাসন ছেড়ে।

রাজার মুখ বর্ষার ঘন মেঘের মতো কালো এবং গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে। দুজন বলবান দেহরক্ষী হঠাৎ চিৎ হ'য়ে পড়ে গেছে, মস্ত ভাবনার কথা। রাজা খুব উত্তেজিত হ'য়ে উঠল, এবং পকেট থেকে অনেকগুলো বাদাম ভাজা একসঙ্গে মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে বলল, সে নিজেই এসে ধ'রবে আমাদের।

রাজাকে উঠতে দেখে আমাদের মনে জাগল কৌতূহল। এতক্ষণে আমাদের মনের ভয় সব কেটে গেছে, তার উপর আমাদের মনে ভরসা জেগেছে যে আর আমাদের কেউ কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। ভাবলাম রাজাও নিশ্চয়ই চিৎ হ'য়ে প'ড়ে যাবে এবং এতগুলো লোকের সামনে তার লজ্জার আর সীমা থাকবে না।

রাজাকে উঠতে দেখে সর্দার তার পা জড়িয়ে ধ'রে বলতে লাগল, "মহারাজ, আপনি এমন কাজ করবেন না, দেখছেন তো দেহরক্ষীরা অবধি হার মেনেছে, আপনি কি ক'রে পারবেন ?"

রাজা গম্ভীরভাবেই সর্দারকে বলল, "তোমরা কেন চিৎ হ'য়ে পড়লে সেটা আমার নিজের একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার।"

সর্দার এর উত্তরে আর কিছু বলতে সাহস করল না। সে

রাজার পা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। রাজা প্রশ্ন করল, "কি ক'রে মাটিতে পড়লে বল তো সর্দার।"

সর্দার বলল, "হঠাৎ কি যেন একটা, যেন কারো মাথা, পেটে ভয়ানক জোরে এক গুঁতো মারল, টাল সামলাতে পারলাম না।"

"সবই কি ঐ একই কারণে প'ড়ে গেছে?"

"আজ্ঞে মহারাজ, ঐ একই কারণে।"

"আমার পেটে ইস্পাতের বর্ম বাঁধা আছে, দেখাই যাক না তার অদৃশ্য মাথায় কত জোর। এই ব'লে রাজা এগিয়ে আসতে লাগল—কিন্তু খুব যে সাহসের সঙ্গে তা নয়, কেননা দেখলাম রাজা একখানা হাত দিয়ে পেট চেপে ধ'রে খুব সাবধানে আসছে। ভাবখানা এই যে যেমন ক'রে হোক পেটটা বাঁচাতে হবে. মোটা রাজার পেটে যদি চোট লাগে তা হ'লে বড় মুস্কিল হবে। রাজার সঙ্গে এগোতে লাগল তার দেহরক্ষীরা, তারাও রাজার অনুকরণে (আত্মরক্ষার তাগিদেও বটে) নিজের নিজের পেট চেপে রাখল।

আমরা দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছি কখন রাজা চিৎ হ'য়ে পড়ে। একবার ভয় হচ্ছে যদি না পড়ে। কিন্তু যাক, মুহূর্তেই সকল ভয় দূর হ'য়ে গেল। রাজা কয়েক পা এগিয়ে আসতেই —এবারে আর চিৎ নয়—উপুড় হ'য়ে মাটিতে প'ড়ে "পিঠ গেল পিঠ গেল" বলে কেঁদে উঠল। দেহরক্ষীরা একলাফে রাজার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার পিঠ টিপে দিতে লাগল। উপুড় হ'য়ে

পড়তে দেখে আমরা ত ভাবনায় পড়লাম। আক্রমণের রীতি বদল হবার কারণ কি? পরেই মনে হ'ল নিশ্চয়ই এ আমাদের বন্ধু বাঘের কাজ, নইলে এমন রসিকতা আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়, কারণ জাত-শিকারী না হ'লে শিকারের দেহে দুর্বলতম জায়গা কোন্‌টি তা আর কেউ কি ক'রে জানবে?

রাজা যখন পেট সামলাতে ব্যস্ত তখন পিঠের কথা তার একেবারেই মনে হয়নি। অথচ দুদিক একসঙ্গে না সামলালে বিপদের হাত থেকে বাঁচা যায় না, আর নির্বোধ রাজা এই কথাটাই জানত না।

কিন্তু রাজার পতনের মত এমন বিপজ্জনক ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও আর এক দিকে আর এক মজার কাণ্ড ঘটল। সেই যে-লোকটির মুখ চেপে ধ'রে কতকগুলো লোক দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, সবার দৃষ্টি পড়ল এবারে তার দিকে। রাজা উল্‌টে পড়ার পর তাকে আর কেউ সামলাতে পারছে না, সে একেবারে দুর্দান্ত হ'য়ে উঠেছে। আর সন্দেহ রইল না যে, সেই লোকটি স্বয়ং খিলং। সে এমন জোরে হেসে উঠল এবং হাসির সঙ্গে সঙ্গে এমন অঙ্গভঙ্গী করতে লাগল যে তাকে আর কেউ ধরেও রাখতে পারল না। এতক্ষণ সবাই এইটেই ভয় করছিল, আর সেই জন্যে সবাই তার মুখ চেপে ধ'রে রেখেছিল।

কিন্তু খিলঙের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই, হাসি পেলে তার কোনো জ্ঞানই থাকে না। সে হাসতে হাসতে মাটিতে গড়াতে লাগল, তা দেখে দর্শকেরা কেউ হাসি চাপতে পারল না,

সবাই মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। রইল শুধু রাজা, তার দেহরক্ষীরা, সর্দার, আর রইলাম আমরা। কিন্তু তা ছাড়াও আরও একজন রইল। কিন্তু রইল বললে ঠিক হবে না, কারণ খিলং সেই যে হাসতে আরম্ভ করেছিল, সেই থেকে তার হাসি আর থামেনি। খিলঙের হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, সে যখন হাসে সে সময় তার সর্বাঙ্গ হাসতে থাকে—তার হাত পা হাসে সবচেয়ে বেশি, তার মুখ চেপে ধরলেও তার হাসির ব্যাঘাত হয় না।

খিলঙের হাসি দেখতে লাগলাম মাঠের উপর। সে মাটিতে প'ড়ে হাসছে আর গড়িয়ে গড়িয়ে দূরে চলে যাচ্ছে। এমনি করে সে মুহূর্তের মধ্যে আধ মাইলেরও বেশি চ'লে গেল গড়াতে গড়াতে। শেষে আর তাকে দেখাই গেল না। খিলঙের ভাগ্য খুব ভাল বলতে হবে, কারণ রাজা সে দিকে মোটেই লক্ষ্য করেনি—তার মনোযোগ এখন অন্য দিকে, মানে আমাদের দিকে, নইলে তাকে আর সেদিন বেঁচে থাকতে হ'ত না।

রাজা আমাদের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল, "একি কাণ্ড! সামান্য দুটো ছোট ছেলের [দুটো ছেলে কারণ নিতাইকে রাজা আর দেখতে পায়নি, সে পকেটে আছে] এমন ক্ষমতা যে এতগুলো লোক তাদের কাছে হার মেনে গেল। কিন্তু···এরা মানুষ তো?"

রাজার মনে এই কথা জাগতেই সে তার দেহরক্ষীদের সঙ্গে

গোপনে কিছুক্ষণ পরামর্শ করল। আমরা কিন্তু একই জায়গায় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। বাঘ এসে চুপে চুপে আমাকে বলল, "ওদের আচ্ছা জব্দ করেছি, আর আমাদের কোনো ভয় নেই, এখন আমরা একেবারে নিশ্চিন্ত। তবে এতগুলো লোকের পেটে আর রাজার পিঠে গুঁতো মারতে মারতে আমার মাথায় বেশ একটু ব্যথা হয়েছে।"

আমি বললাম, "কাছে এগিয়ে এসো, তোমার মাথাটা একটু টিপে দিই।"

বাঘ বলল, "উঁহুঁ, মাথা টেপাবার মতো সময় আমার হাতে নেই, আমার আরও অনেক কাজ বাকী আছে।—তবে একটা কাজ কর তো ভাল হয়, তোমার পকেটে অ্যাস্‌পিরিনের বড়ি আছে? থাকে তো ডজন খানেক দাও, এক বারে খেয়ে ফেলি, আমার আবার দু-একটায় কাজ হয় না।"

আমি বললাম, "অ্যাস্‌পিরিনের বড়ি তো আমার পকেটে নেই, কি করা যায় বল তো?

বাঘ বলল, "তা হ'লে তো আর কোনো উপায়ই নেই—থাক, আমার মাথা ব্যথা একটু পরে আপনা থেকেই সেরে যাবে। তপস্যায় বসতে পারলে এখুনি সেরে যায়, কিন্তু এখন আর সময় নেই, আমাকে এখন সব দিক দেখতে হবে। তোমরা রাজার দিকে লক্ষ্য রাখ, আবার ওরা যেন কি মতলব আঁটছে।"

রাজার দিকেই লক্ষ্য রাখলাম। দেখলাম রাজা উঠে

দাঁড়াচ্ছে এবং ঐ সঙ্গে দেহরক্ষীরাও! তাদের মুখের ভাব এবারে সম্পূর্ণ অন্য রকম, সে এমন একটা ভাব যা লিখে বোঝানো যায় না। রাজা দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের দিকে কাতরভাবে তাকিয়ে বলল, “আর আমরা আপনাদের আক্রমণ করব না।”

কথাটা শুনে বিশ্বাস হ'ল, বলার ভঙ্গীতে বেশ আন্তরিকতা ফুটে উঠেছিল। রাজা বলতে লাগল, “আমি বুঝতে পেরেছি আপনারা মানুষ নন, দেবতা; আজ ভাগ্যগুণে আপনাদের দেখা পেয়েছি। এতক্ষণ না বুঝে আপনাদের প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করেছি তার জন্যে আমার ভয়ানক দুঃখ হচ্ছে। আমি আপনাদের কাছে জোড় হাতে ক্ষমা ভিক্ষা করছি, আপনারা আমার প্রতি কৃপা করুন।”

দ্বাদশ অধ্যায়

হঠাৎ ভাগ্য

আমি দেখলাম এ এক মজা মন্দ নয়, রাজা আমাদের দেবতা মনে করেছে ! মণ্টুর সঙ্গে তাড়াতাড়ি একটু পরামর্শ ক'রে নিলাম, বাঘের সঙ্গেও দুএকটা কথা হ'ল, এবং সর্বসম্মতি-ক্রমে ঠিক করলাম রাজার ভুল ভাঙব না। রাজাকে বললাম, "এখন তা হ'লে বুঝতে পেরেছ আমরা কে ?—আমরা স্বর্গ থেকে মানুষের ছদ্মবেশে নেমে এসেছি তোমাদের দেশে। তোমরা আমাদের উপর যে অন্যায় করেছ সে জন্যে আমরা মনে কিছুই করিনি, কারণ তোমরা তো আর আমাদের চিনতে পারনি। তবে অন্যায় যে একেবারেই করনি তা নয়। ধর, দেবতা না হ'য়ে যদি আমরা মানুষই হতাম তা হ'লেই কি আমাদের উপর এই রকম অত্যাচার করা তোমাদের ঠিক হ'ত ?"

রাজা অত্যন্ত লজ্জিতভাবে বলতে লাগল, "কথাটা ঠিকই বলেছেন, মানুষের উপরেই বা আমরা অত্যাচার করব কেন ? ওটাও আমাদের অন্যায়। যাই হোক, আর কখনও এমন কাজ করব না। কিন্তু দেবতা, যদি আমাদের উপর আপনারা এতটা দয়াই প্রকাশ করলেন তখন একটি অনুরোধ আমার রাখতেই হবে।"

মণ্টু বলল, "নিশ্চয়ই রাখব, বল কি তোমার অনুরোধ।"

রাজা বলল, "আপনারা চলুন আমার সঙ্গে, আমি আপনাদের নিয়ে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ক'রে সেইখানে আপনাদের পূজো করব। নতুন একটা মন্দির গড়াব, আপনাদের যত্নের কোনো ত্রুটি হবে না।"

মণ্টু বলল, "সে কি ভাল হবে? স্বর্গ ছেড়ে দুএক দিনের জন্য এসেছি। আমরা স্বর্গের স্কুলে পড়ি, তিন দিন মাত্র আমাদের ছুটি, সেই ছুটিতে ব্যাঘ্রবাহনে আমরা এখানে এসেছি, ছুটি ফুরোবার আগেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।"

রাজা প্রশ্ন করল, "ব্যাঘ্রবাহন কি?"

আমি বললাম, "আমাদেব এক বাহন আছে তার নাম রয়্যাল বেঙ্গল, তাকে আমরা হিমালয়ের এক গুহায় রেখে এসেছি।"

রাজা আর একটু এগিয়ে এসে বলল, "দোহাই দেবতা, আপনারা আমাকে ফাঁকি দেবেন না, আপনাদের অন্তত দিন সাতেক আমার মন্দিরে থাকিতেই হবে। সাত দিন পরে পূর্ণিমা, সেই পূর্ণিমায় আপনাদের খুব ঘটা ক'রে পূজো দেব, তারপর আপনারা আমাকে আশীর্বাদ ক'রে চলে যাবেন।"

আমি বললাম, "সে হয় না রাজা, স্কুল কামাই করলে আমাদের জরিমানা হবে, স্বর্গের বড় কড়া নিয়ম।"

রাজা বলল, "জরিমানা কত লাগবে বলুন, আমি রাজকোষ

থেকে তার ব্যবস্থা করব। কিন্তু আপনাদের কিছুতেই ছাড়ব না।”

এই কথা ব’লে রাজা আমাদের খুব ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করল, তা দেখে দেহরক্ষীরাও আমাদের পায়ের ধুলো নিল, কেবল সর্দার বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল; কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে নয়, সেও এগিয়ে এসে আমাদের প্রণাম করল, কিন্তু তার মনে তখনও কিছু সন্দেহ রয়ে গেছে এটা বেশ বোঝা গেল।

কিন্তু খানিকটা মজা করার জন্যে নিজেদের দেবতা ব’লে স্বীকার ক’রে এ কি হ’ল? শেষে সত্যিই মন্দিরে দেবতা হয়ে থাকতে হবে নাকি? মণ্টুর সঙ্গে পরামর্শ করলাম, “সে বলল, ক্ষতি কি?”

ঠিক এই সময় পকেটটা খুব ভারী মনে হ’তে লাগল, পকেটের মধ্যে হাত দিয়ে দেখি ভয়ানক কাণ্ড! আমার মানিব্যাগ ছিঁড়ে নিতাইয়ের মাথা বেরিয়ে পড়েছে। নিতাই বলল, শীগগির আমাকে মুক্ত ক’রে দাও।”

নিতাইকে ব্যাগ ছিঁড়ে মুক্ত করলাম, সে মাটিতে নেমেই চট্ ক’রে আগের মতো বড় হ’য়ে গেল। এতক্ষণ সে ছোট হয়ে ছিল ভয়ে, কিন্তু পকেট থেকেই রাজার কথা শুনে সে বুঝতে পেরেছে তার বিপদ কেটে গেছে, তাই আনন্দে সে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল।

মানিব্যাগটা আমার হাতেই ছিল, কিন্তু তার মধ্যে যে

গোটাকতক পয়সা ছিল, গেল কোথায় ? নিতাই বলল, "ভয় নেই, সেগুলো আমার পকেটে আছে, ব্যাগ ছিঁড়ে গিয়েছিল বলেই পয়সাগুলো আমার পকেটে পুরেছি।"

নিতাইকে পকেট থেকে এই ভাবে বেরিয়ে আসতে দেখে রাজা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল, তার আর সন্দেহ রইল না যে আমরা খাঁটি দেবতা। রাজা এবং আর সবাই তখন নতুন ক'রে নিতাইয়ের পায়ের ধূলো নিল। সর্দারের মন তখনও সন্দেহে দুলছে !

রাজা বলল, "আপনারা এখানে আর একটু অপেক্ষা করুন, আপনাদের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছি।" বলেই তিনি দেহরক্ষীদের আদেশ দিলেন, "লোক ডাক, শোভাযাত্রার আয়োজন কর।"

দেহরক্ষীরা ছুটে গেল শোভাযাত্রার আয়োজন করতে। সর্দার সব দেখে-শুনে হতভম্ব হ'য়ে বসে রইল।

রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "আমার দেশটা আপনাদের কেমন লাগল বলুন।"

আমি বললাম, "সত্যিই খুব চমৎকার। এ রকম দেশ আমরা বোধ হয় আর দেখিনি, ভারি ভাল লেগেছে আমাদের। বিশেষ ক'রে ভাল লেগেছে তোমাদের হোটেল, তোমাদের ডাক্তার, তোমাদের পাঠশালা, তোমাদের থিয়েটার আর তোমাদের নাট্যকার। তা ছাড়া তোমাদের পথঘাটও আমাদের কাছে খুব মনোরম মনে হয়েছে। যত

আবর্জনা সব রাস্তার উপরে ফেলা হয় এবং সমস্ত পথে যে রকম দুর্গন্ধ, তাতে মনে হয় তোমাদের সহ্য করার ক্ষমতা অন্য দেশের মানুষের চেয়ে খুব বেশি। তোমাদের হোটেলে এঁটো ভাত খাওয়ার ব্যবস্থাতেও রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা তোমাদের মধ্যে বেশ বেড়ে গেছে নিশ্চয়।"

রাজা একটু হেসে বলল, "কজন লোক এটা বুঝতে পারে?"

আমি বললাম, "লোকে বুঝুক আর না বুঝুক, তোমাদের তাতে কোনো ক্ষতি নেই। যা ভাল মনে হয় তোমরা তাই করবে।"

রাজা খুশী হ'য়ে বলল, "যদি একটু উৎসাহ দেন তা হ'লে তাই করব।"

এইভাবে কিছুক্ষণ আলাপ করতেই শোভাযাত্রার দল এসে হাজির হ'ল, তাদের সব নানা রঙের পোষাক, সঙ্গে অনেক বাদ্যযন্ত্র।

শোভাযাত্রার আয়োজন দেখে এমন হাসি পাচ্ছিল যে কি বলব! লম্বা লম্বা বাঁশ বেঁধে ওরা তিনটে উঁচু আসন তৈরি করেছে আমাদের জন্যে। তাকে আসন বললে আসনকে অপমান করা হয়। আমাদের সম্বন্ধে তাদের ধারণা অত্যন্ত উঁচু হওয়াতেই আমাদের বসবার জায়গাগুলোকে ওরা প্রাণপণ শক্তিতে উঁচু করেছে। এমন উচ্চ সম্মান নাকি আর কেউ এদের দেশে পায়নি।

যা হোক আমরা কোনো রকমে অতি ভয়ে ভয়ে বাঁশের

মাথায় গিয়ে উঠলাম। বহু লোক নিয়ে চলল আমাদের বহন ক'রে।—আমাদের অনুসরণ ক'রে চলল হাজার হাজার

লোক—তাদের চীৎকার আর বাদ্যযন্ত্রের শব্দে কান ফেটে যেতে লাগল।

পথের দুধারে লোক আর ধরে না। স্বর্গ থেকে তিনটে ক্ষুদে দেবতা স্কুলের ছুটিতে পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছে, কথাটা শহরের মধ্যে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে, সবাই ঘর থেকে বেরিয়েছে আমাদের দেখতে। আমরা সিংহাসন থেকে তাদের প্রণাম গ্রহণ করতে লাগলাম।

শোভাযাত্রা সমস্ত শহর ঘুরে একটা ছোট পুকুরের ধারে এসে থামল। সেই পুকুরের ধারে ছোট একটা মন্দির ছিল, সেইখানে আপাতত আমাদের থাকার জায়গা ঠিক হ'ল। হাজার হাজার লোক এল আমাদের দেখতে আর পায়ের ধূলো নিতে। কিন্তু অত ধূলো পাব কোথায়? বললাম, "আমরা কাউকে পায়ের ধূলো দিই না, আমরা এখন মানুষের ছদ্মবেশে আছি, এ অবস্থায় আমাদের ধূলোর কোনো দাম নেই।"

কিন্তু কারো কানেই সে কথা গেল না, আমরা মন্দিরের সামনে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সবাই সেইখানকার ধূলো মুঠো মুঠো তুলে নিয়ে যেতে লাগল। ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল, জায়গাটায় মস্ত এক গর্ত হ'য়ে গেছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভোগ ও ভোগান্ত

আমরা মন্দিরে বসে আছি আর ভাবছি কি মজাটাই না হ'ল! এখানে ক'টা দিন বেশ আরামেই কাটানো যাবে, খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে তো একেবারে নিশ্চিন্ত।

এতক্ষণে বাঘের দেখা পাওয়া গেল, সে আগের মতোই অদৃশ্য হ'য়ে আছে। সে বলল, "তোমাদের পক্ষে এটা একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কি? দেবতা ব'লে পরিচয় দিয়েছ, কিন্তু তার জের টানা কি উচিত হবে?"

মণ্টু বলল, "উপায় কি? একমাত্র উপায় ছিল আক্রমণকারীদের প্রথমেই মেরে ফেলা, কিন্তু তুমি তা না ক'রে যা করেছ তাতেই তো ওরা মনে করেছে আমরা দেবতা।"

নিতাই খুব সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, "আমরা দেবতা ব'লে পরিচয় দিয়েছি, তাতে আমাদেরই অন্যায় হবে, ওদের তো আর হবে না।"

বাঘ বলল. "যা হয়েছে বেশ হয়েছে. কেবল ভোগের সময় ব'লে দিও রোজ একটা ক'রে পুষ্ট ছাগ যেন এখানে রেখে যায়।"

সন্ধ্যায় বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে আমাদের পূজো হ'য়ে গেল.

খাবার ব্যবস্থা হ'ল খুবই চমৎকার, ছাগও একটা চেয়ে নিলাম। সেটা দুপুর রাত্রে বাঘের পেটে গেল।

সকালে মন্দিরের সামনে লোক আর ধরে না। সবাই এসেছে এক একটা বর প্রার্থনা করতে—ছেলে বুড়ো সবাই।

ভীড়ের মধ্যে একটি ছ'সাত বছরের মেয়ের দিকে আমার চোখ পড়ল। তার মুখখানা বড় বিষণ্ণ, সেও এসেছে দেবতার কাছে কিছু চাইতে কিন্তু চাইবার সাহস তার নেই, অত্যন্ত ভীরু, তাই সে করুণ চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার সেই চোখের দিকে চেয়ে, আমরা যে দেবতার অভিনয় করছি সে জন্যে বড় লজ্জা হ'ল। হাজার হাজার লোভী স্বার্থপর লোকের মধ্যে ঐ একটি মেয়ে সঙ্কোচে জড়োসড়ো হ'য়ে আছে; জীবনে তার বোধ হয় কখনও কোনো ইচ্ছা পূরণ হয়নি, তার মুখখানা দেখে তাই মনে হয়।

আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বললাম, "হে ভগবান, এরা যে-পূজো আমাদের দিচ্ছে তা তুমি নিও এবং আমাদের অপরাধ ক্ষমা ক'রো।"

কতকগুলো লোক ভীড় ঠেলে এসে মন্দিররক্ষীকে জিজ্ঞাসা করল, "দেবতারা কি এই পুকুরের জল খেয়েছেন?"

মন্দিররক্ষী বলল, "না।"

তারা আবার জিজ্ঞাসা করল, "ওঁরা কি এই জলে স্নান করেছেন?"

মন্দিররক্ষী বলল, "হ্যা, করেছেন।"

কথাটা শোনামাত্র সেই লোকগুলো ছুটে গেল কুরের দিকে। গিয়ে ভক্তিভরে সেই জলে নেমে স্নান ক'রে চলে গেল। তারা চলে যাবার একটু পরেই আর এক দল লোক এসে ঐ পুকুরে স্নান করল। তারপর এল আর এক দল, তারপর আর একদল। ক্রমে একশো থেকে দুশো, দুশো থেকে চারশো, শেষে হাজার হাজার লোক এসে নামল ঐ পুকুরে। পুকুরের জল ক্রমে পাঁকে পরিণত হ'ল, কিন্তু স্নানের শেষ হ'ল না। পাঁকের মধ্যে মোষ যেমন ক'রে গড়াতে থাকে লোকগুলোও তেমনি ক'রে সেই পাঁকের মধ্যে গড়াতে লাগল। শেষে পাঁকও শুকিয়ে এল, পাঁক শক্ত মাটিতে পরিণত হ'ল, দলে দলে লোক এসে সেই শুকনো মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। তারপর যারা এল তারা সেই মাটি খুঁড়ে নিয়ে যেতে লাগল। এইভাবে নিতে নিতে গভীর পুকুর আরও গভীর হ'য়ে গেল। তখন আবার জল দেখা দিল সেখানে, এবং তাতে আবার সবাই মাথা ডোবাতে লাগল। এইভাবে চলল সারা দিন এবং সারা রাত।

পরদিন হাজার হাজার লোকের সর্দিজ্বর হ'ল, কিন্তু সবাই ডাক্তার ব'লে কেউ কারো চিকিৎসা করল না, সবাই এল আমাদের কাছে মাদুলি নিতে।

কিন্তু সর্দিজ্বরে কি মাদুলি দেব কিছুই জানতাম না। বাঘ কানে কানে ব'লে দিল, "তোমাদের পূজোর জন্য যে সব ফুল তোমাদের পায়ের কাছে প'ড়ে আছে ঐ থেকে এক এক টুকরো

ছিঁড়ে দাও, ওরা ঐসব টুকরো মাদুলিতে পুরে গলায় আর হাতে বাঁধবে।

পাঁচ মিনিটে একগাদা ফুল শেষ হ'য়ে গেল, নৈবেদ্যের চাল ছিল, একটা একটা ক'রে দিতে দিতে তাও ফুরিয়ে গেল। শেষে বললাম, "আজ আর কিছু নেই, কাল এসো।"

মন্দিরের সামনের ভীড় অনেকটা কমে গেল। তখন বাঘকে বললাম, "ভাই বাঘ, আর ভাল লাগছে না। প্রথমে বুঝতে পারিনি, ভেবেছিলাম খুব মজা হবে; কিন্তু দু'দিনেই বুঝতে পেরেছি এ রকম দেবতা-সেজে থাকা মানুষের কাজ নয়। তা ছাড়া হাজার হাজার মানুষের প্রার্থনা পূরণ করতেই সব মজা শেষ হ'য়ে গেছে, প্রথম দিনেই সবার সর্দিজ্বর হয়েছে, এর পর যে কি হবে তা ভেবেই পাচ্ছি না। অনেক লোককে বর দিয়েছি, অনেক লোককে মাদুলি দিয়েছি, কিন্তু ওতে যদি কারো অসুখ না সারে তা হ'লে আমাদের উপর ওদের আর ভক্তি থাকবে না, তখন হয় তো আবার আমাদের সন্দেহ করবে, হয়তো আবার অনিষ্ট করতে চাইবে।

বাঘ বলল, "মোটেই তা নয়। ওদের অসুখ যদি খুব বেড়েও যায়, এমন কি যদি অনেকে মরেও যায়, তবু ভয় নেই। ওদের অসুখ যত বাড়বে ভক্তিও ওদের তত বেড়ে যাবে, ওরা ভাববে ওদের পাপের জন্যেই অসুখ সারেনি। তখন আবার ওরা আমাদের কাছে আসবে। যদি কেউ আমাদের সুমুখেই

মারা যায়, তা হ'লে সবাই বলবে, "লোকটা বড় ভাগ্যবান, একেবারে দেবতার চোখের সুমুখে মারা গেছে।"

মণ্টু বলল, "কিন্তু তাতে আমাদের লাভ কি?"

বাঘ বলল, "আপাতত পূজো পাওয়াটাই লাভ। কিন্তু আরও একটা কথা ভেবে দেখ। ওরা যে সাত দিন পরেই তোমাদের ছাড়বে তা মনে ক'রো না। আর যদি ছাড়েও তা হ'লেই বা যাবে কি ক'রে? ওদের সামনে এখন মাটির উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে তোমাদের লজ্জা করবে। ওরা আশা ক'রে থাকবে, তোমরা যখন স্বর্গ থেকে এসেছ তখন ওদের চোখের সামনে সোজা স্বর্গে উড়ে যাবে। তা যদি না পার, তা হ'লে ওরা তোমাদের চাতুরি ধ'রে ফেলবে।"

"তা হ'লে কি করা যায়?" নিতাই প্রশ্ন করল।

বাঘ বলল, "আজ রাত্রেই এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া ভাল।"

মণ্টু বলল, "কিন্তু চারদিকে এত লোক, এত প্রহরী, দিনরাত তারা এই মন্দিরে রয়েছে, তাদের সামনে পালাব কি ক'রে?"

বাঘ একটু ভেবে বলল, "সেই এক মুস্কিল। তবে তোমরা সুযোগ খুঁজতে থাক, সুযোগ পেলেই এখান থেকে পালাতে হবে।"

আমরা খুব গোপনে এইসব পরামর্শ করতে লাগলাম। রাত তখন দুপুর। মনে হ'ল যেন প্রহরীরা সব ব'সে

ব'সে ঢুলছে। আমরা সেই সুযোগে পা টিপে টিপে পালিয়ে যাব সব ঠিক, এমন সময় বাইরে কার পায়ের শব্দ! শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি আমাদের আসনে ফিরে গিয়ে চুপচাপ ব'সে রইলাম। দেখি রাজা এবং রানী আসছে আমাদের পূজো দিতে। সঙ্গে একটা ছাগও এনেছে।

তারা ঘণ্টাখানেক ধ'রে আমাদের পূজো দিয়ে চলে গেল। রাজারানী আসাতে মন্দিরের প্রহরীরা সবাই জেগে উঠে আবার চারদিক পাহারা দিতে লাগল—রাত্রে তারা আর ঘুমলো না।

বাঘ বলল, "আচ্ছা দাঁড়াও, আর একটা মতলব মাথায় এসেছে। আজ রাত্রে পালিয়ে যাওয়ার আশা ছাড়, যা হয় কাল দেখা যাবে।"

কিন্তু একটা দিন আমাদের পক্ষে যে কি রকম কষ্টকর হয়ে উঠল তা আর কি বলব! আমরা অনেকগুলো ভুল যা করেছি, তার মধ্যে একটা হচ্ছে বিছানা নিতে অস্বীকার করা। দেবতা ঘুমোবে ব'লে রাজা বিছানার বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিল, কিন্তু ঝোঁকের মাথায় তখন বলেছিলাম ঘুমোতে আমাদের বিছানা দরকার হয় না। তার ফলভোগ করছি এখন।

সমস্ত দিন ধ'রে হাজার হাজার লোকের পূজো পাওয়ার মতো কঠিন কাজ আর নেই। বুঝতে পারলাম এই কারণেই দেবতারা মানুষ থেকে তফাতে থাকেন।

দিনশেষে রাত এল। বাঘ কোত্থেকে অনেকগুলো খড় আর দড়ি সংগ্রহ ক'রে এনে বলল, "এই দিয়ে তিনটে দেবতার মূর্তি তৈরি কর, আমি মাটি আনছি।"

বাঘের এই কাজ দেখে সে যে কি মতলব আঁটছে তা সহজেই বোঝা গেল। সে চায় আমরা তিনটে মূর্তি তৈরি ক'রে আমাদের আসনে বসিয়ে রেখে পালিয়ে যাই। এতে সবাই ভাববে ওগুলো আমাদেরই মূর্তি, এবং আমরা যে এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছি তা আর ভাবতে পারবে না। আমরা তাড়াতাড়ি কোনো রকমে তিনটে মূর্তি তৈরি ক'রে লুকিয়ে রাখলাম। সে মূর্তি যে কি অপরূপ হ'ল তা আর ব'লে কাজ নেই। যা হোক, কোনো রকমে আরও একটা দিন কাটিয়ে দিয়ে রাত্রেই পালানো ঠিক ক'রে ফেললাম।

বিকেল থেকেই আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল। সন্ধ্যার দিকে মেঘ আরও কালো হয়ে এল, সবাই বলল ঝড় উঠবে। ঝড়ের কথা শুনে আমাদের খুব আনন্দ হ'ল, কেননা সেই গোলমালে পালিয়ে যেতে আর অসুবিধা হবে না।
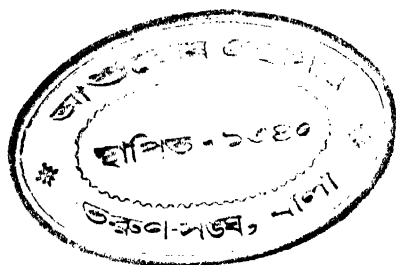
চতুর্দশ অধ্যায়

মুক্তি লাভ

মুহূর্তের মধ্যে ঝড় উঠে এল।

জামাজুতো সব খুলে রেখে এ ক'দিন দেবতা হ'য়ে দেবতার আসনে ছিলাম, পালিয়ে যাবার আগে সব প'রে নিলাম।

হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখি পকেটে আমার মানি-ব্যাগটি নেই। শেষে দেখি পকেটটিও নেই, কে কেটে নিয়েছে! মণ্টুও চমকে উঠে দেখে তারও পকেট কাটা!

বাঘ বলল, "নিশ্চয় শোভাযাত্রার সময় ভীড়ের মধ্যে কেউ কেটে নিয়েছে।"

নিতাই অবাক হ'য়ে বলল, "আমাদের দেবতা জেনেও পকেট কাটল?"

বাঘ বলল, "পকেট কাটার সময় এদের ও সব জ্ঞান থাকে না। এদের ভক্তির চেহারাই অন্য রকম। তোমরা যেমন ঝড়ের গোলমালে পালিয়ে যাবে ঠিক করেছ, ওরাও তেমনি ভক্তির গোলমালের মধ্যে দেবতাদের পকেট কাটবে ব'লে ঠিক করেছিল। এখানেও চেয়ে দেখ, ভক্তেরা তোমাদের যত অলঙ্কার দিয়েছিল ভক্তেরাই সে সব চুরি ক'রে নিয়ে গেছে, একটিও প'ড়ে নেই।"

চেয়ে দেখি সত্যিই তাই। যারা গড় হ'য়ে প্রণাম করেছে আর পায়ের ধূলো নিয়েছে তারা ঐ সঙ্গে রাজার দেওয়া মুক্তার মালা, রানীর দেওয়া মুকুট সব সাফ্ ক'রে নিয়ে গেছে। টাকা পয়সাও অনেক ছিল, কিছুই নেই।

যাক, আর ভেবে কি হবে! ঝড় ক্রমেই খুব বেড়ে যাচ্ছে, এমন ভীষণ ঝড় কখনও দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে কান্নার মতো একটা শব্দ হচ্ছে। প্রবল বাতাস ঘুরতে ঘুরতে ধূলো বালি পাতা সব মাটি থেকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঝড়ের শব্দের সঙ্গে মানুষের চীৎকার মিলে সব এক হ'য়ে যাচ্ছে। লোকেরা ছুটোছুটি ক'রে পালিয়ে যাচ্ছে, কেউ ঘর চাপা প'ড়ে, কেউ গাছ চাপা প'ড়ে মারা যাচ্ছে, প্রতি মিনিটে ঝড়ের বেগ যাচ্ছে বেড়ে।

আমরা এতখানি সুযোগ পাব কল্পনাও করতে পারিনি। ঝড়ের গোলমালে যখন সবাই নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় আমরা মন্দির থেকে বেরিয়ে পড়লাম। নিতাই বেরিয়েই বলল, "আমি পারছি না—নিজেকে ধ'রে রাখতে পারছি না, ঝড়ে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।" বাঘ বলল, "আমার লেজ ধ'রে চলে এসো।"

নিতাই বাঘের লেজ ধ'রে আমাদের সঙ্গে ছুটতে লাগল।

ছুটতে ছুটতে কিছুদূরে যেতেই কার হাসির শব্দে চমকে উঠলাম। এই ঝড়ের মধ্যে প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে হাসে কে?

মণ্টু বলল, "নিশ্চয় সেই লোকটি।"

নিতাই প্রশ্ন করল, "কোন্ লোকটি ?"

মণ্টু বলল, "খিলঙ। লড়াইয়ের মাঠে সে হাসতে আরম্ভ করেছিল, সেই হাসি তার এখনও থামেনি।"

আমি বললাম, "আমার কিন্তু তা মনে হয় না। খিলঙ যদি হয় তা হ'লে নতুন কোনো ব্যাপার নিয়ে হাসতে আরম্ভ করেছে, কেননা এই সংসারে তার হাসি জাগানোর এত জিনিস আছে যে একই জিনিস নিয়ে সে এতদিন ধ'রে অবিরাম হাসবে এ রকম মনে হয় না।"

কিন্তু বলতে বলতেই খিলঙের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আমি প'ড়ে গেলাম, সেও পড়ে গেল এবং প'ড়ে গিয়েও সে হাসতে লাগল।

মণ্টু তাকে বলল, "কে তুমি এই ঝড়ের মধ্যে হাসতে হাসতে চলেছ, তোমার কি একটুও ভয় নেই ?"

খিলঙ হো হো হো হো ক'রে হাসতে হাসতে বলল, "যে তিনটে ছেলে আমাদের দেশে এসেছে তারা নাকি মানুষ নয়, দেবতা, হো হো হি হি—তাই শুনে আমি আর হাসি থামাতে পারছি না, হো হো হো—আমি তাদের দেখতে যাচ্ছি।"

আমি মাটি থেকে উঠে বললাম, "তা হ'লে তোমার কোনো দোষ নেই, তুমি আর দেরি ক'রো না, তাড়াতাড়ি তাদের দেখতে যাও।"

খিলঙ মাটি থেকে উঠেই ছুটতে লাগল, তার হাসির শব্দ ক্রমে ঝড়ের সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

আমরাও ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে শহরের সীমা ছাড়িয়ে এসে পড়লাম একটা পাহাড়ের ধারে। সেইখানে খুঁজে খুঁজে একটা গুহা পাওয়া গেল, ঝড়ের মধ্যে আমরা সবাই সেইখানে আশ্রয় নিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড় থেমে গেল, এবং রাত্রিও শেষ হ'য়ে এল।

মন্টু বলল, "চল এইবার পাহাড় পার হ'য়ে দেশে ফিরে যাই।"

নিতাই বলল, "কোনো কথা না ব'লে কাজ আরম্ভ কর,—এখানে আর এক মিনিটও থাকতে চাই না।"

আমরা সবাই পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম —কিন্তু কিছুদূর উঠেই দেখি বাঘ আমাদের সঙ্গে নেই।— বাঘ গেল কোথায়?

নিতাই বলল, "সে তো আমাদের সঙ্গে আসেনি, তাকে গুহার মধ্যেই বসে থাকতে দেখেছি।"

অনেকখানি উপরে উঠে এসেছি, এখন আর নীচে নেমে বাঘের সন্ধান নেওয়া সম্ভব নয়। বাঘ যদি দয়া ক'রে অদৃশ্য অবস্থায় আমাদের সঙ্গে এসে থাকে তা হ'লেই মঙ্গল, নইলে বাঘের কাছ থেকে এই আমাদের চির বিদায়।

মন্টু বলল, "আচ্ছা, বাঘের কোনো অসুখ করেনি তো?

নইলে আমাদের সঙ্গে না আসার তো কোনো কারণই আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

শূন্য জায়গা থেকে উত্তর এল, "ভয় নেই আমি সঙ্গেই আছি এবং সুস্থই আছি, তবে রওনা হ'তে একটু দেরি হ'য়ে গেছে। তোমরা রওনা হওয়ার পর আমি একটু ধ্যানে বসেছিলাম। সূর্যদেব সবে উঠেছেন দেখে তাঁকে আর অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। তাঁকেই ধ্যান করছিলাম। তবে এখন আর তোমাদের সঙ্গে আমার থাকার দরকার নেই, পথে আর তোমাদের কোনো বিপদ হবে না।"

আমি বললাম, "তা হয় না, তোমাকে কলকাতা ফিরে যেতেই হবে।"

বাঘ হেসে বলল, "বল কি! কলকাতা যাব কেমন ক'রে? সেখানে কি আর আমাকে কেউ জায়গা দেবে? কলকাতার পথে এমন ভীড় যে সেখানে অদৃশ্য হ'য়েও চলাফেরা করতে পারব না। যদি নেহাৎ না ছাড়, তা হ'লে কলকাতার পথে একবার সুন্দরবনে যেতে পারি।"—আমরা এ কথায় খুশী হ'লাম।

কাঞ্চনবুড়োকে কথা দিয়েছিলাম, ফেরবার সময় দেখা ক'রে যাব, তাই প্রথমে আমরা তার কাছেই গেলাম। বুড়ো কেমন ক'রে টের পেয়েছে যে আমরা আসছি, তাই আমাদের জন্যে সব আয়োজনই তার পাকা। চা তৈরি হ'য়ে আছে, তার সঙ্গে ফলমূলও প্রচুর। পেঁপে, কলা,

কমলানেবু, তার নিজের বাগানের। তা ছাড়া বাঘের জন্যেও ভাল ব্যবস্থা হয়েছে, তার জন্যে একটা হরিন রাখা হয়েছে।

কাঞ্চনবুড়ো বলল, "তোমরা সবাই অতিথি, তোমাদের সবারই জন্যে ব্যবস্থা করেছি।" আমরাও পত্রপাঠ খেতে আরম্ভ করলাম। বাঘ বলল, "হরিনটা আর তোমাদের সামনে খাব না, আমার খাওয়া দেখতে বড় বিশ্রী, ওকে আড়ালে নিয়ে খেয়ে আসি।"

কাঞ্চনবুড়ো বলল, "স্বচ্ছন্দে। আমার পিছনে গিয়ে খেয়ে এসো।" বাঘ হরিনকে টেনে নিয়ে গেল সেইখানে। আমরা ইতিমধ্যে চা ইত্যাদি খাওয়া শেষ করলাম, খেয়ে কি যে তৃপ্তি আর আরাম হ'ল সে আর কি বলব! এ ক'দিন দেবতার খাদ্য খেয়েও এত আরাম পাইনি।

খাওয়া শেষ ক'রে বাঘের জন্যে অপেক্ষা করছি, এমন সময় দেখি বাঘ আর হরিন দুজনেই ফিরে আসছে।

আমরা ব্যাপার কিছু বুঝতে পারলাম না।

বাঘ বলল, "খাওয়া গেল না ভাই, ওর মুখখানা দেখে বড় দয়া হ'ল। তা ছাড়া ও আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি দোষ করেছি যে আমাকে খাবে?'—এমন কথা আজ পর্যন্ত আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। তা ছাড়া ওর আরও একটি কথায় আমি মুগ্ধ হয়েছি।"

নিতাই জিজ্ঞাসা করল, "কি কথায়?"

বাঘ বলল, "ওর কাছে শুনলাম এক অদ্ভুত কথা। ও

বলল, 'ভারতবর্ষের হাজার হাজার বাঘ হিংসা ছেড়ে দিয়েছে, তুমিই কি তা পারবে না?' কথাটা ভাল ক'রে বুঝলাম না, কিন্তু এমন ভাবে বলল যাতে বিশ্বাস না ক'রে থাকা গেল না, এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম আমিও হিংসা ছেড়ে দেব।"

নিতাই হরিনকে জড়িয়ে ধ'রে বলল, "তুমি কলকাতা যাবে?"

হরিন খুশী হ'য়ে বলল, "যাব।"

বাঘ বলল, "আমি আর যাব না। হিংসা যখন ছেড়েই দিলাম তখন আর দেশে ফিরব না, এখানেই থাকব।"

বাঘ কিছুতেই ফিরতে রাজি হ'ল না। অগত্যা আমরাই কাঞ্চনবুড়োর কাছ থেকে আর বাঘের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দার্জিলিং হ'য়ে কলকাতা ফিরে এলাম। নিতাই হরিনটাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। আমি বাড়ি ফিরেই ঘুমিয়ে পড়লাম, ঘুম থেকে উঠে দেখি বেলা আটটা বেজে গেছে।
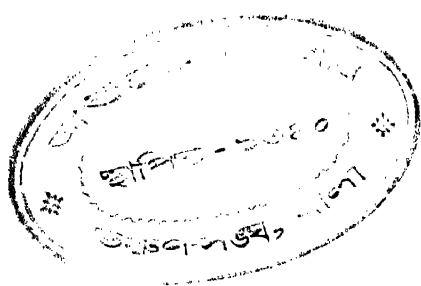
শ্রীপরিমল গোস্বামীর লেখা

বুদ্বুদ (গল্পের বই)	১॥•
ক্যামেরার ছবি	
(ফোটোগ্রাফি শিক্ষার বই)	৩৲
দুষ্মন্তের বিচার (কৌতুক নাট্য)	
পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ	১।০
ঘুঘু (আটটি কৌতুক নাটিকার সমষ্টি)	২৲